বড় হওয়ার স্বপ্ন

আব্দুল হামীদ ফাইযী

মুখবন্ধ

'বড় হওয়ার স্বপ্ন' সকলের জীবনেই আছে। পাঠকের হাতে তেমন একটি স্বপ্নের কাহিনী এক প্রবাসী ভাইয়ের। যিনি বড় হতে গিয়ে ছোট হয়ে যান, চলার পথে পদে পদে হোঁচট খান, উন্নতির পর্বত-চূড়ায় পৌঁছে যাওয়ার কিছু পূর্বে পিছল কেটে নিচে পড়ে যান। যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে,

'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে,
বারেক হতাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
বিপদে পতিত তবু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলে হতে পারে কাল।'

যিনি জীবনে বহু লাঞ্ছিত হয়েছেন, ব্যথা পেয়েছেন, বেদনার কাঁটায় কোমল হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তবুও আশা রাখেন,

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

যিনি জীবনে বহু ভুল করেছেন এবং সে ভুল শুধরে নিয়েছেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলার পর, আলোর পথের দিশা পেয়েছেন। যাঁর 'বড় হওয়ার স্বপ্ন' আছে, স্বপ্ন বাস্তব করার প্রচেষ্টা ও সাধনা আছে। যিনি ভুল করেছেন এবং চান যে, তাঁর মতো ভুল যেন কেউ না করে। যিনি দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন এবং চান যে, তাঁর মতো দুঃখ-কষ্ট যেন কেউ না পায়।

তাঁর হাতে এবং তাঁর মতো 'বড় হওয়ার স্বপ্ন'-ওয়ালাদের হাতে আমার এটি ক্ষুদ্র উপহার। আমার আশা, তাঁরা সকলেই এই উপহারের যেটি ভোগ্য, সেটি ভোগ করবেন এবং যেটি ত্যাজ্য, সেটি ত্যাগ করবেন।

বিনীত---
গ্রন্থকার
সউদী আরব
২৮/৩/২০১১

(১)

রাজীব তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র হিসাবে সে বড় ভাল। আরও পাঁচটা ছাত্র-ছাত্রীর মতো তার মনে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, পরিকল্পনা আছে। উঠতি যৌবনের এ বয়সে মনের আবেগ আছে, স্ফূর্তি আছে।

পরীক্ষা আসন্ন হল। রাজীব বিদ্যালয়ে পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ড আনতে গেল। সেখানে দেখা হল প্রায় সকল সহপাঠীদের সাথে। চারিপাশের কয়েকটি গ্রামের মধ্যস্থলে এ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীই শেষ শ্রেণী। অতএব পরীক্ষার আগে এখানে সমবেতভাবে এই দেখা হয়তো শেষ দেখা। তাই বাংলার শিক্ষক মহাশয় সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে কার্ড বিতরণের পূর্বে সকলকে উপদেশ দিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি বড় আন্তরিক, বড় আদর্শ। শিক্ষার প্রসারে দেশ ও দশের উন্নতি হোক, তা তিনি মনে-প্রাণে চান। তিনি চান, শিক্ষিতরা মানুষ হোক, ছেলে-মেয়ে সকলেই নৈতিকতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থেকে শিক্ষিত হোক এবং তারা সুন্দর পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও দেশ গড়ে তুলুক।

নানা কথা বলতে বলতে তিনি বললেন, 'আজকের মতো আর কোনদিন হয়তো আমরা একত্রে সমবেত হতে পারব না। আমার আশীর্বাদ থাকল তোমাদের সাথে। তোমরা বড় হও, উন্নত হও। আচ্ছা তোমাদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা কী বল তো? এক এক ক'রে বল।'

শ্রেণীর প্রথম স্থান যার দখলে, সে বলল, 'স্যার! আমি শিক্ষক হতে চাই এবং আপনার মতো আদর্শ শিক্ষক হয়ে দেশে শিক্ষার মান ও শিক্ষিতের হার বাড়াতে চাই।'

একজন বলল, 'আমি ডাক্তার হতে চাই।'

কেউ বলল, 'আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।'

কেউ বলল, 'আমি অফিসার হতে চাই।'

কেউ বলল, 'আমি উকীল হতে চাই।'

একজন বলল, 'স্যার! আমি কিন্তু পুলিশ হতে চাই।'

শিক্ষক মহাশয় তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার, তুমি পুলিশ কেন হতে চাও?'

উত্তরে সে বলল, 'স্যার! আসলে আমি খুব শীঘ্র ধনী হতে চাই। আর পুলিশ হলে ঘুস খেয়ে তাড়াতাড়ি তা হওয়া যাবে!'

এ কথা শুনে সকলে হেসে উঠল। হাসির কথাই তো। সে পরিবেশ থেকে গ্রহণ করেছে ভবিতব্যের পরিকল্পনা। তাছাড়া বড় কিছু হতে হলে বড় পয়সা খরচও তো আছে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে কি সকলের সাধ্যে কুলাবে?

রাজীব তখন ভাবছিল, সে কী বলবে? কী হবে সে? সাহিত্যিক, লেখক, শিক্ষক, নাকি অন্য কিছু? সমাজে সে অনেক বড় হওয়ার রঙিন স্বপ্ন দেখে। অনেক সফল মানুষের সফলতা তাকে হাতছানি দিয়ে আহবান করে। কিন্তু যে আশা তার মনে বাসা বেঁধেছে, তার পথ বড় দুস্তর, বড় বন্ধুর। টাকার অশ্ব ছাড়া তা অতিক্রম করা বড় দুঃসাধ্য। তাছাড়া যে যাই বলুক, সকলের উদ্দেশ্য কিন্তু সেই টাকার সোনার হরিণ শিকার। টাকা ছাড়া কি বড় হওয়া যায়?

জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই এমন বন্ধুর পথে পাড়ি দিয়ে বড় হয়েছেন। তাঁরা অর্থের স্বপ্ন না দেখলেও শিক্ষার আলো জ্বালতে গিয়ে দেখেছেন, অর্থ তাঁদেরকে সাদর আহবান জানাচ্ছে। তাঁরা অর্থ না চাইলেও, অর্থ তাঁদের পিছু ছাড়েনি। সুনাম-সুখ্যাতি লাভের সাথে সাথে অর্থও তাঁদের চিরসাথী হয়েছে। চেষ্টার ত্রুটি না ক'রে ভাগ্য তাঁদের সাথ দিয়েছে।

রাজীব মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কী উত্তর দেবে। মনে মনে ভাবতে লাগল,

আমি সবার সেরা হব শুধু কাজের গুণে,
হাসবে নাকো তোমরা কেহ আমার কথা শুনে।
আমি হব বীর ক্ষুদিরাম পড়ব গলে ফাঁসি,
মৃত্যু দেখে ভয় পাব না, ফুটবে মুখে হাসি।
দেশে আমার সুনাম হবে, রাখব জাতির মান,
মায়ের কাছে করব প্রমাণ, আমি তার সন্তান।

ভাবতে ভাবতে তার পালা এসে গেল। 'রাজীব! তুমি কী হতে চাও।'

'আল্লাহ যা করবেন, তাই হব স্যার! আমিও খুব বড় হতে চাই স্যার।'

মনের আশা মনের গহীন কোণে অব্যক্ত রেখে জবাব এড়িয়ে গেল রাজীব।

কিন্তু সে শুনেছিল, আশা ও বাসা করলে বড়ই করতে হয়। আশা ছোট করতে হয় না, আর বাসাও না।

(২)

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হল। রাজীব প্রথম শ্রেণী লাভ করেছে। কিন্তু লেখাপড়ায় অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আর তার নেই। আব্বা দ্বীনদার ছোট ব্যবসায়ী। টানাটানির সংসার। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই বড় বড় পোস্টে চাকরি করে। তার খালুজান একজন আর্মি ক্যাপটেন। কোন এক সময় কথায় কথায় তিনি রাজীবকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি মাধ্যমিক পাশ কর। আমি তোমার চাকরি ক'রে দেব।'

রাজীবের মনে সেই আশ্বাস প্রবোধ ও বিশ্বাস হয়ে মনকে নিরুদ্বিগ্ন ক'রে রেখেছিল। ভেবেছিল, অধিক লেখাপড়া ক'রে বড় না হতে পারি, কর্মক্ষেত্রে আমি বড় হব। খালুজানের ক্ষমতাও ছিল তার চাকরিটা ক'রে দেওয়ার। কিন্তু সম্ভবতঃ হিংসাবশতঃ তিনি আর ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অনুরোধ ও আবেদন সত্ত্বেও তিনি এড়িয়ে গেলেন। ফলে এত পানির মাঝে থেকেও রাজীবের আফোটা পদ্ম-কলি অকালে শুকিয়ে গেল।

কিন্তু তার মনের ভিতরে ছিল অদম্য সাহস ও উৎসাহ। জীবন-যুদ্ধে সে হেরে যাবে, এমন ভয় তার মনে ছিল না। বিশেষ ক'রে কেউ অবজ্ঞা ও অবহেলা করলে মনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব-প্রবণতা চরমে উঠে। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো মনোভাব তখন তীব্র হয়ে উঠে। রাজীবেরও তাই হল। বেকারত্ব দূর করার জন্য নানা পরিকল্পনা করতে লাগল মনে মনে, সংগোপনে, রজনীর তমস অন্তরালে।

এক রাতে এশার নামায পড়ে বাড়ির সকলে ভাত খেতে বসেছে। বাড়িতে এসেছে মামাজান। তখন কারো খাওয়া শেষ হয়নি, রাজীব অর্ধেক খেয়ে হাত ঝেড়ে উঠে পড়ল।

চট্ ক'রে মামা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? পুরো ভাত না খেয়ে উঠে পড়লে যে!'

---আমার পেট ভরে গেছে মামা!

---এত কম খেলে শরীর ভেঙ্গে যাবে যে বাবা!

---না, না ঠিক আছে।

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মা বলে উঠল, 'ওর তরকারি পছন্দ হয়নি ভাই! আধা-মাধা খেয়ে ঐভাবে ও প্রায় উঠে যায়।'

মামা হাসতে হাসতে বলল, 'ভাল তরকারি খেতে হলে ইনকাম করতে হবে তো। এবার বড় হয়েছ, ইনকাম করতে শেখো। আব্বার মতো ব্যবসায় নামো। আচ্ছা! তোমার খালু চাকরি ক'রে দেব বলেছিল, তা কী হল?'

এবারে আব্বা বলল, 'চাকরি কি পড়ে আছে নাকি? ক'রে দেব বললেই এত সহজ!'

মা বলল, 'ইচ্ছা করলে জামাই পারবে। কিন্তু এখন কোন গুরুত্ব দেয় না কেন জানি না।'

হাসতে হাসতে মামা বলল, 'বিয়ে দেওয়ার মতো মেয়ে নেই যে!'

রাজীব লজ্জা পেল। হাত ধুয়ে নিজের রুমে বেড়ে গিয়ে বসল।

মামাও হাত ধুয়ে পুনরায় রাজীবকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'চাকরির আশায় না থেকে, কিছু একটা ক'রে ইনকাম কর।'

'কোন কাজ ছোট নহে, নহে তা নগণ্য,
যদি পার কিছু কর, জীবনের জন্য।'

শুনেছ দেশের নেতাদের কথা, 'নো ওয়ার্ক, নো ব্রেড।'

এতক্ষণে রাজীব মামাকে পেয়ে বসল। প্রথম আব্দার ক'রে অকপটে সে তাকে বলে ফেলল, 'তুমি আমাকে একশ' টাকা দাও, আমি ইনকাম শুরু করব।'

---একশ' টাকা দিয়ে কী ব্যবসা করবে?

---দাও তো, তারপর দেখবে।

---ঠিক আছে, কাল আমার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে।

পরদিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে বড় উদ্দীপনার সাথে আল্লাহর নাম নিয়ে মামার নিকট থেকে একশ' টাকা নিয়ে বাজারে গেল। তা দিয়ে কয়েক রকম কাঁচা তরি-তরকারি কিনে বাড়ি ফিরল। মা দেখে বলল, 'এত সব সবজি কী হবে বাবা?'

রাজীব সহাস্য বদনে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যবসা করব মা! রাস্তার ধারে বারান্দায় বসে বিক্রি করব।'

---ব্যবসা? এই সামান্য সবজি নিয়ে ব্যবসা? এতে কী হবে? জাতও যাবে, আর পেটও ভরবে না।

আরো অনেক কিছু বকাবকি ক'রে মা মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

রাজীব মা-কে বুঝাতে লাগল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আব্বা বলেন, বসে থাকার চেয়ে বেগার যাওয়া ভাল। বসেই তো থাকব। যা হয়, তাই লাভ। কিছু না থাকার চাইতে কিছু থাকা কি ভাল নয় মা?'

মায়ের মন, বুঝাতে হয় তাকেই। কিন্তু ছেলের নিকট হতে বুঝের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। পরবর্তীতে আব্বা ও মামা সাহস দিলে রাজীবের মনোবল আরো সুদৃঢ় হল। ব্যবসার 'বিসমিল্লাহ'তে তার ভালই লাভ হল। তারপর সে আরো বেশি কাঁচামাল খরিদ ক'রে ব্যবসাকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলল। একদিন সে মুদিখানায় বসে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সহ ফলমূল ইত্যাদির ব্যবসাও করতে লাগল। এর ফলে সংসারে সচ্ছলতার বর্কত পরিদৃষ্ট হল। ছোট থেকে এক ধাপ এক ধাপ ক'রে যে বড় হতে চায়, সে একদিন বড় হয়---তা তার অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হতে লাগল।

(৩)

রাজীবকে ব্যবসা করতে দেখে তার কোন কোন আত্মীয়-বন্ধু আজীব হয়ে উপহাস করতে লাগল। সহপাঠীদের তুলনায় সহপাঠিনীদের টিপ্পনী সহ্য করা তার পক্ষে দায় হয়ে উঠল। কেউ কেউ পরামর্শ দিল, এখন থেকে ব্যবসা কেন? এখন তো লেখাপড়ার বয়স। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যা। লেখাপড়ার প্রবণতাকে হেলায় নষ্ট ক'রে দিস না।

কিন্তু রাজীব বলে, 'সংসার চলবে কীভাবে? লেখাপড়ার খরচ আসবে কোত্থেকে?'

তাছাড়া আবার বাদ সাধলেন খালুজী। তিনি বললেন, 'আমি এ বছরে কর্নেল হয়ে যাব এবং স্থানান্তরিত হয়ে দিল্লি যাব। এক বছরের ভিতরে তোমার চাকরি ক'রে দেব। আর এক বছরের মধ্যে কোন ডিগ্রিও হবে না। সুতরাং লাভ কী?'

রাজীব আবারও ভুলে গেল খালুজীর কথায়। আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে দেখাই যাক। অমুসলিম দেশে মুসলিম ছেলের চাকরিতে একটু বেগ তো পেতেই হয়, বহু খড়-কাঠ পুড়াতে হয়, বহু পাঁপড় বেলতে হয়। ডুবেছি যখন, তখন দেখা যাক, তল কত দূর?

সুতরাং শত মন্ত্রণার মাঝে আবার ব্যবসায় ভালভাবে মনোযোগ দিল। তাতে যেন তার মন এক প্রকার তৃপ্তি অনুভব করতে লাগল। ব্যবসার সকল প্রকার কৌশল অজানা থাকলেও মিষ্টি ব্যবহারের কারণে ভাগ্য তার সঙ্গ দিল। ব্যবসা ঊর্ধ্ব গতিতে উন্নতির পর্বত-শিখর জয় করতে উদ্যত হল।

ক্রমে ক্রমে রাজীব টাকার পিছনে দৌড় দিতে শুরু করল। যে পথে টাকা আসে, সে পথ যত ছোটই হোক, তা অবলম্বন করতে সে দ্বিধা করল না, কারো পরোয়া করল না। অবশ্য বৈধভাবে, সাধু পথে। অবৈধ ব্যবসায় সে পা বাড়ায় না।

তার মনে-প্রাণে সে জানত,

'জীবিকার নাই উচ্চ বা নীচ, কোন কাজ নয় হীন,
আলস্য পাপ, তাই সঞ্চিত পুণ্যেও করে ক্ষীণ।'

যদি সে বলে, 'নিচু কাজ করব না', তাহলে সচ্ছলতা কোত্থেকে আসবে? যদি বলে, 'কাদা পথে হাঁটব না', তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে কীভাবে?

"জাল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর',
জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।"

সুতরাং হাফ শহর গ্রামের ফুটবল ময়দানে খেলায় লোকজন জমলে সে সেখানে গিয়ে লজেন্স্ ও চানাচুর বিক্রি করে। কোনদিন বিক্রি করে আখ। তাতে তার আত্মসম্মানে বাধে না। কিন্তু আত্মীয়রা ধনী বলে তাদের সম্মানে বাধে। ফলে তাদের অনেকেই তার সাথে কথা বলা বন্ধ ক'রে দেয়। অনেকে পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ বোধ করে। অনেকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে। কিন্তু রাজীব পিছপা হতে নারাজ।

আত্মীয়দের মধ্যেও তার প্রতি অনেকে হিংসা রাখে। আর সেই হিংসুকদের অবস্থা বাক্সে আবদ্ধ অনেক কাঁকড়ার মত। যাদের একজন ওপর দিয়ে উঠে পালাতে চাইলে নিচে থেকে একজন তার পা ধরে উঠতে চায়। কিন্তু সে আসলে তাকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। ফলে কেউই উঠে পালাতে পারে না। হিংসুকরা নিজেরাও অগ্রসর হতে পারে না, আর অপরকেও অগ্রসর হতে দেয় না।

অবশ্য আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে এমন কিছু হিতাকাঙ্ক্ষী লোক ছিল, যারা তাকে এ কাজে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করত। এক দিক থেকে আঘাত এলে অপর দিকে তার প্রলেপের ব্যবস্থা না থাকলে যে মানুষ এ সংসারে টিকতেই পারত না। এ সংসারের রীতিই এই যে, অনেক বিরোধী হলেও

সবাই হয় না। বিশেষ ক'রে সৎপথের সাথীরূপে অনেককে পাওয়া যায়। নদীর এক কূল ভাঙ্গলে অন্য কূল গড়ে।

ব্যবসার সাথে ব্যবসায়ী মন-প্রাণ না দিলে ফললাভ হয় না। দেহকে মাটি না করলে, মাটি থেকে খাঁটি সোনা ফলানো যায় না। খাঁটি সোনা লাভের আশায় রাজীবও নিজেকে মাটি করছিল, বড় মেহনত করছিল। কারো ভরসা না ক'রে শহর থেকে নিজে মাল তুলে নিয়ে আসত। তাতে তার আনন্দও ছিল। যে কাজে লাভ থাকে, সে কাজে আনন্দ থাকারই কথা। কোন এক অজানা আনন্দে একদিন বাসের ছাদে মাল তুলছিল। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে গিয়ে সে আঘাতপ্রাপ্ত হল। এতে বড় কিছু দুর্ঘটনা না ঘটলেও তাকে চিকিৎসা করাতে হয়েছিল।

এক্ষণে আব্বা-আম্মার মনে অধিক দয়া-মায়ার সঞ্চার হল। তারা তাকে এমন ব্যবসায় নিজেকে ধ্বংস ক'রে দিতে নিষেধ করতে লাগল।

আব্বা ছিল ভ্রাম্যমান বস্ত্র-ব্যবসায়ী। সে তাকে সেই ব্যবসা করতে উপদেশ দিল। তাতে মেহনত কম, লাভ বেশি, নোকসানের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে কাঁচামাল ও সবজির ব্যবসায় নোকসানের আশঙ্কা আছে, মেহনত আছে।

রাজীব বলল, 'আমি কাপড়ের ব্যবসা করব। কিন্তু আপনার সাথে যৌথ ব্যবসা নয়। আমি পৃথকভাবে ব্যবসা করতে চাই।'

আব্বা তাতে সম্মতি দিল। কিন্তু কাপড়ের দোকান করতে গেলে তো অনেক টাকার প্রয়োজন। তা কোত্থেকে যোগাড় হবে?

আব্বার পরিচিত দোকান ছিল। সেখান থেকে নিজের জমানো টাকা দিয়ে কিছু এবং কিছু ধারে মাল নিয়ে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে দোকান খুলে বসল রাজীব। আল্লাহ যার সহায় হন, মা-বাপের দুআ যার সাথী হয়, ভাগ্য যার সাথ দেয়, সে কোনদিন অসফল হয় না। কাপড়ের ব্যবসাতেও সে অসাধারণ সফলতা অর্জন করতে লাগল।

(৪)

মানুষ যখন সফলতার সিংহাসনে বসে, তখন তার অনেক বন্ধু জোটে। ভ্রামরী মিত্রতা শুরু হয়। ফুলে মধু থাকলে ভ্রমরের মতো ফুলের সাথে বন্ধুত্ব করে। দুঃখ পেলে একাকী বসে সইতে হয়, বইতে হয়। আর সুখ পেলে

অনেকে সুখের ভাগী হতে চায়। সংসারের এই রীতি থেকেও রাজীব তার জীবনকে স্বতন্ত্র রাখতে পারল না।

রাজীবের এখন অনেক বন্ধু। বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করতে চায় অনেক যুবতীও। কিন্তু রাজীব বড় আজিব ধরনের চালাক ছেলে। কোন মেয়েকে সে পাত্তাই দেয় না। এমনকি যে বন্ধুর বান্ধবী আছে, সে তাকে উপদেশ দেয় নারী-সঙ্গ বর্জন করতে। নারীর নেশা মনে ধরে বসলে পেশা ও চরিত্র যে উচ্ছন্নে যাবে, সে কথা রাজীব ভালমতো বুঝে। পূর্ব কোন অভিজ্ঞতালব্ধ এ জ্ঞান তার নয়। অনেকের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার গোলাপ-নির্যাস সে তার হৃদয়-পাত্রে সংরক্ষিত রেখেছে। আর সেটাকেই সে প্রয়োজনে আতর স্বরূপ ব্যবহার করে। পরের দেখে যে শিক্ষা নেয়, নিশ্চয় সে জ্ঞানী। রাজীব সত্যই একটি জ্ঞানী যুবক।

কিন্তু পরিবেশ ও সংসর্গের একটা বিশাল প্রভাব আছে। যেমন তার সুগন্ধ আছে, তেমনি তার বিকট দুর্গন্ধও আছে। আর সেই দুর্গন্ধই রাজীবের আতরের সুগন্ধকে ঢেকে ফেলতে চাইল।

কাপড়ের দোকানে নিত্য-নতুন কত কিশোরী-যুবতী আসে। কত সুস্মিতা তন্বী ও নিতম্বিনী তাকে মুগ্ধ করে। কারো প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়ে কাপড়ের দাম কম নেয়। কাউকে বিনামূল্যে উপহার স্বরূপ দান করে এবং দানের বিনিময়ে প্রতিদান পাওয়ার আশা করে।

দুধের মাছি বন্ধুরা তার দোকানে আড্ডা জমায়। দোকানের টাকা ভেঙ্গে বন্ধুদের মন প্রীত করে। স্তাবক তোষামুদে মানুষের পাল্লায় পড়েও অনেক টাকা নষ্ট করে সে। বন্ধু-বান্ধবীদের পাল্লায় পড়ে বাস-স্ট্যাণ্ডস্থ হলের কোন নতুন বই বাদ পড়ত না। যার ফলে দোকানের লভ্যাংশ হ্রাস পেতে থাকে। কত টাকা ক্রেতাদের কাছে ঋণ পড়ে থাকে। দোকানের মাল কম হতে লাগে।

যে জ্ঞানী অপরের দেখে শিক্ষা নিতো, সে জ্ঞানীর জ্ঞান হারিয়ে গেল। এক সময় তার দোকান বসে গেল।

আবার কোমর সোজা ক'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রাজীব। তার ছোট খালুজান বাজারের ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। সে স্থির করল, তাঁকে বলে ব্যাঙ্ক থেকে এক লক্ষ টাকা লোন নিয়ে নতুনভাবে বড় ক'রে দোকানটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলবে। কিন্তু আবেদন-পত্র লেখার সময়ে কোন কোন বন্ধু তাকে তাতে বাধা দিল। তারা বলল, 'যদি তার পরেও তোর দোকান সচল না হয়,

তাহলে তুই আর জীবনে কোমর সোজা ক'রে উঠে দাঁড়াতে পারবি না।'

সত্যিই তাই। সুতরাং এ পরিকল্পনা পরিহার ক'রে আবারও বড় খালুজান কর্নেল সাহেবের দরজায় কড়া নাড়ল। দিল্লি গিয়ে তাঁর চাকরি ক'রে দেওয়ার কথা ছিল। তিনি তাঁর সেই কথা রক্ষা করুন। কিন্তু তিনি টালবাহানা ক'রে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। অবশ্য তিনি একটা নতুন প্রস্তাব দিলেন।

তার খালুরা জানতেন, রাজীব বড় সফল ব্যবসায়ী। সুতরাং তাকে দিয়ে তাঁরা ব্যবসা করবেন। কিন্তু সে হবে দোকানের বেতন-ভোগী কর্মচারী। পুরো লাভ ভোগ করবেন তাঁরা। চাকরি ক'রে দিলে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা হবে না জেনে এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁরা তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু রাজীব সে স্বার্থপরতাপূর্ণ দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে অপমানে, রাগে, দুঃখে ও ঘৃণায় একবাক্যে তা প্রত্যাখ্যান ক'রে দিল।

কিন্তু তার স্বপ্ন পূরণ হবে কীভাবে? আব্বা এখনও ছোট্ট গুমটি নিয়ে ব্যবসা করে। তার প্রস্তাব হল, সে ফেরিওয়ালা হয়ে কাপড়-ব্যবসা করুক। কিন্তু তাতে হয়তো তার পেট চলবে, কিন্তু রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন যে বাস্তব হবে না।

অর্থ অপচয় ক'রে কত বড় ভুল সে করেছে, তার মাসূল দিতে হবে আগামী জীবনে। অথচ মূল জীবনের প্রারম্ভও তো এখনও দেখেনি সে।

রাজীবের আরো একটা ভাল দিক, সে নিরাশাবাদী নয়। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেও সে নিজের উদ্যম হারায় না। যে বিফলতা তাকে শিক্ষা দিয়েছে, তাই হয়তো আবার তার জীবনে সফলতার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেবে। আর তারই অনুসন্ধানে থাকল সে।

(৫)

বহুদিন পর গ্রামের এক ইমাম সাহেব এসেছেন বড় সুন্দর। পাশ করা আলেম। তবে ফাযেল-টাইটেল দিলে তাঁর বড় চাকরি হবে, হাই স্কুল অথবা হাই মাদ্রাসায় চাকরি পাবেন তিনি, অনেক বেতন হবে তাঁর। তাছাড়া গলার সুর-সার খুবই ভাল। মীলাদও পড়েন বড় সুন্দর। লোকটির ভাষায় আকর্ষণ আছে, ব্যবহারে মাধুর্য আছে, চরিত্রে সৌন্দর্য আছে। কয়েক মাসের ভিতরে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে মুগ্ধ ক'রে তুললেন। মসজিদের মকতবে কুরআন শিক্ষার ধুম পড়ে গেল। ছেলে-মেয়ে-সহ বুড়োরাও তাঁর

কাছে কায়দা-আমপারা পড়তে, কুরআন শিখতে লাগল।

গ্রামে পর্দা নেই। ইমাম সাহেব পাড়ায়-পাড়ায় ঘরে-ঘরে ঘুরতে পারেন, ঢুকতে পারেন। এই সুবাদে কিছু মহিলা তাঁর ভাবী, কিছু তাঁর নানী, কিছু তাঁর খালা ইত্যাদি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে লাগল।

বাড়িতে বাড়িতে পালা ক'রে খানা খান ইমাম সাহেব। কেউ পৌঁছে দিয়ে যায় মসজিদে, যার পৌঁছে দেওয়ার মতো কেউ নেই, তার বাড়িতে নিজে গিয়ে খেয়ে আসেন তিনি।

দ্বীন-দরদী মুসলিম সমাজ আলেম পছন্দ করে। তাঁকে 'সৎলোক' বলে অনেকে আদর-যত্ন ক'রে খাওয়ায়, কেউ খাওয়ায় আল্লাহর ওয়াস্তে, কেউ খাওয়ায় অন্য কোন আশায়।

যার বাড়িতে বিবাহযোগ্য কন্যা আছে, তার বাড়িতে পালা পড়লে মৌলবী সাহেব খেতে পান জামাই-আদরে।

অবশ্য মৌলবী সাহেবের আরো একটা আকর্ষণীয় দিক আছে, তিনি ছবি আঁকতে পারেন। ফুল-ফল, গাছ-পালা, লতা-পাতা ইত্যাদি এঁকে দিয়ে মহিলা-মহলে তিনি বেশ বড় পরিমাণ জায়গা দখল ক'রে নিয়েছেন।

মসজিদে মেয়েরা যখন পড়তে আসে, তখন অনেকে সঙ্গে সাদা কাপড় নিয়ে আসে। কেউ রুমাল করার জন্য, কেউ বালিস-কভার করার জন্য ফুল আঁকিয়ে নিয়ে যায় উস্তাদজীর নিকট থেকে। অবশ্য তার জন্য তিনি পৃথক পারিশ্রমিকও পান। অবশ্য যে দেয় না বা দিতে পারে না, তিনি তার কাছে চেয়ে নেন না।

তিনি এক প্রকার ডাক্তারও। তিনি তাবীয ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে বহু রোগের চিকিৎসাও ক'রে থাকেন। আর তাতেও তিনি অর্জন করেছিলেন ভাল খ্যাতি।

সুমধুর ব্যবহারের কারণে যুবকরাও তাঁর কাছে ভিড় জমায়। এক সাথে খাওয়া-দাওয়াও করে অনেকে। অনেক সময় চাঁদা তুলে মসজিদের মক্তবে চড়াইভাতিও ক'রে আনন্দ উপভোগ করে সকলে।

কিন্তু এমন রান্না-বান্না মসজিদ-চত্বরে বেশি হতে লাগলে কিছু মুরুব্বীর চোখে খারাপ ঠেকতে লাগল। একজন তো বলেই ফেলল, 'ওহ! তোমরা দেখছি মসজিদটাকে হোটেল বানিয়ে ফেলবে।'

অবশ্য ইমাম সাহেবকে কিছু বলতে হয়নি। যুবকরাই তার জবাব দিয়ে

দিল।

একদিন যোহরের নামাযের পর এক শিক্ষিত যুবক ইমাম সাহেবের রুমেই বসে ছিল। এমন সময় পালি-বাড়ির ভাত এল। যুবক বলে উঠল, 'আপনাদের কী মজা! যথাসময়ে খানা এসে হাজির।'

মৌলবী সাহেব বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি তাঁর দ্বীনের খাদেমদেরকে এইভাবে রুযী দান করেন।'

---আপনাদের সম্মানও জামাইয়ের মতো।

অতঃপর দু'জনেই হেসে উঠল। খাবারের খাঞ্চা ঢাকা ছিল একটা তোয়ালে দিয়ে। সেটা তুলতেই ইমাম সাহেব দেখলেন তার এক পাশে মুরগীর বিষ্ঠা লেগে আছে!

ইমাম সাহেব বললেন, 'এই দেখুন ভাইজান, ইমাম সাহেবের সম্মান! নোংরা তোয়ালে ঢেকে ভাত পাঠিয়েছে।'

---ইস! ছিঃ ছিঃ! বাড়ির মহিলা সম্ভবতঃ কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তাড়াহুড়া ক'রে দিয়ে পাঠিয়েছে। অথবা মোটা হুঁশের মেয়ে আছে।

---অনেক মেয়ে নোংরাও হয়। অনেক বাড়ি থেকে খানা আসে, তাদের প্লেটগুলোও ঠিকমতো ধোয়া থাকে না।

---সব বাড়ি তো সমান নয় সাহেব!

---তাহলে বুঝতে পারছেন তো, সবারই কাছে আমরা 'জামাই-আদর' পাই না। এমনও মানুষ আছে, যে ইমাম সাহেবকে ভাত দিতে চায় না। সমাজের চাপে বদনামের ভয়ে ভাত দিতে বাধ্য হয়ে দেয়। অনেকে নিজের গাছের প্রথম ফলটি ইমাম সাহেবকে খাওয়ায়, কিন্তু অনেকে যেটা খেতে পারে না, সেটা দিয়ে পাঠায়। একটা গল্প শুনবেন?

---শোনান, শোনান।

---এক গ্রামে এক ইমাম সাহেব ছিলেন। একদিন সকালে এক ছয়-সাত বছর বয়সের ছাত্রী তাঁর জন্য দুধ নিয়ে এল মাটির হাঁড়িতে। ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী এনেছ তুমি হাঁড়িতে?' মেয়েটি আমতা আমতা ক'রে বলল, 'জী দুধ, দাদী বলল, মৌলবী সাহেবকে দিয়ে আস্‌গা।' ইমাম সাহেব বললেন, 'কার মেয়ে তুমি?' বলল, 'কারীমুলের।' ইমাম সাহেব বললেন, 'তো তোমাদের বাড়ির লোক তো আমার পালিও নেয় না। কোনদিন কিছু হাদিয়াও পাঠায় না, তো আজ আবার তোমার দাদী দুধ দিয়ে

পাঠাল কী ব্যাপার?' মেয়েটি কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে বলতে গিয়ে থেমে গেল। ইমাম সাহেবের মনে সন্দেহ হল। তিনি ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে মেয়েটিকে বারবার জিজ্ঞাসা করলে সে ভয়ে ভয়ে বলেই দিল, 'জী! দাদী বলতে বারণ করেছে।' ইমাম সাহেব তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই। সুইটি বোনটি আমার! বল তো কী ব্যাপার?' তখন মেয়েটি বলল, 'জী! দুধটা চুলোশালে রাখা ছিল। নিয়ে কুকুরে মুখ দিয়ে দিয়েছে। তাই মাটির হাঁড়িতে ঢেলে দিয়ে দাদী বলল, এতগুলো দুধ ফেলে দিবি, মৈলিবীকে দিয়ে আসগা।' মৌলবী সাহেব কী এত বড় অপমান হজম করতে পারেন? রাগে হাঁড়িটি উপর দিকে তুলে 'দুম' ক'রে মেঝেয় মারলেন। আর অমনি তা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল এবং দুধ গড়িয়ে নর্দমায় পড়ল। তা দেখে মেয়েটি সশব্দে 'এ্যাঁ-এ্যাঁ' ক'রে কাঁদতে লাগল। ইমাম সাহেব বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' বলল, 'আমাকে দাদী মারবে। আপনি হাঁড়িটা ভেঙ্গে দিলেন কেন?' ইমাম সাহেব বললেন, 'কেন? হাঁড়িটা কী এমন কাজে লাগত, মাটির পুরনো হাঁড়িই তো।' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতেই আধা-আধা শব্দে বলল, 'রাতের বেলায় ওই হাঁড়িতে আমার দাদী মুতত!'

গল্প শুনে যুবক হেসে গড়াগড়ি দিল। ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি আপনাকে দুঃখের ঘটনা শুনালাম। আর আপনি এইভাবে হাসছেন?'

---না, না। এ বানানো গল্প।

---হতে পারে, কিন্তু ঘটনার উপমা বাস্তব।

---কিন্তু এও তো বাস্তব যে, অনেক ইমাম সাহেব নিজের সম্মান বজায় রাখতে জানেন না। অনেকে মহিলা-ঘটিত চক্রান্তের খপ্পরে পড়ে নিজের মান-মর্যাদা হারিয়ে বসেন।

---তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিছুদিন গত হতেই ইমাম সাহেব সেই শ্রেণীর ফাঁদে পড়তে ও বাঁচতে লাগলেন। একদিন সকালের চায়ের সাথে দেওয়া মুড়ির ভিতরে দেখেন একটি পত্র আছে। সেটি ছিল পালি-বাড়ির এক যুবতীর পাঠানো প্রেমপত্র!

অনেক কিশোরী ইমাম সাহেবের খিদমতে মন-প্রাণ দিয়ে হাজির থাকে। 'আপনার রুমটা পরিষ্কার ক'রে দেব জী? কলসীতে ঠাণ্ডা পানি এনে দেব জী? আপনার জামাটা কেচে দেব জী?' ইত্যাদি।

পড়াবার সময়ও তিনি কিছু যুবতীর ভাবে-ভঙ্গিতে ঐ শ্রেণীর আকর্ষণ

লক্ষ্য করেন। মোবাইলেও ম্যাসেজ আসে একই আবেদন নিয়ে। কেউ আবার তাঁর নাম লিখে রুমাল ক'রে উপহার দিয়ে পাঠান। অনেক অভিভাবক নিজ কন্যার সাথে প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে 'প্রাইভেট-টিউটর' হিসাবে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন, যাতে বিনা পণে বিয়েটা লেগে যেতে পারে।

বাস্তব এটাই যে, অবিবাহিত কোন যোগ্য যুবক হলে বিবাহের আগে পর্যন্ত তার মান বেশ উচ্চ থাকে এ যুগে মেয়ের বাবাদের কাছে। বিশেষ ক'রে সেই যুবকের, যে বিনা পণে যৌতুক না নিয়ে বিয়ে করবে বলে ধারণা করা হয়।

(৬)

রাজীবের বোন ইমাম সাহেবের কাছে পড়ার সুযোগ পায়নি। যেহেতু সে প্রথমতঃ কুরআন পড়তে জানত, আর দ্বিতীয়তঃ যে বয়সের যুবতীরা মসজিদে গিয়ে কুরআন পড়ে, তাদের তুলনায় তার বয়স কিছু বেশি হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আরো পাঁচজন মেয়ের বাবার মতো রাজীবের আব্বারও বড় ইচ্ছা ছিল, ইমাম সাহেব তাদের জামাই হন। ইমাম সাহেবের সাথে রাজীবের খাতিরও ছিল ভাল। তিনি বাড়িতে আসা-যাওয়াও করেন। অনেক সময় তিনি রাজীবের দোকানে গিয়ে বসেও থাকেন।

মনের অব্যক্ত কথাটি একদিন আব্বা রাজীবকে বলেও ফেলল। কিন্তু সে কীভাবে ইমাম সাহেবকে প্রস্তাবটা দেবে, তা ঠিক ক'রে উঠতে পারছিল না। একদিন কথা প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবই একটি বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে তার পরামর্শ নিতে কথা তুললেন। সেদিনই রাজীব তাদের মনের কথাটি ইমাম সাহেবকে জানিয়ে দিল।

ইমাম সাহেব মহা দ্বন্দ্বে পড়লেন। কয়েকটি বাড়ি থেকে একই প্রস্তাব। এখন তিনি কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টি গ্রহণ করবেন। বিচারের মনে তিনি গরীবদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর ধনীদের মধ্যে রাজীবের প্রস্তাবকে প্রাধান্য দিলেন। কারণ প্রথমতঃ তার বোন সুন্দরী এবং আখলাক-চরিত্রে ভাল। দ্বিতীয়তঃ প্রায় দুই বিঘা জায়গার উপর তাদের পাকা বাড়ি, কল-বাথরুম ও বাগান আছে। জমিও আছে অনেকখানি। তার সাথে উঠতি মুখে তাদের ব্যবসা। ভেবে-চিন্তে তিনি রাজীবের সাথেই আত্মীয়তায় জড়িয়ে পড়লেন। টাইটেল পরীক্ষার পরেই বিয়েটা সেরে নিলেন।

আলেম জামাই পেয়ে খুশী হল তার আব্বা-আম্মা, খুশী হল সে নিজেও। কিন্তু বছর ঘুরতেই তার বোন নাখোশ হয়ে গেল। এক রাত্রে স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি হতে হতে সে বলেই ফেলল, 'শুনেছিলাম, মৌলবীরা মেয়েলোভী হয়। আমি জানি সে কথা সর্বাংশে সত্য নয়, তবে আপনার ব্যাপারে তা সত্য বলে মনে হয়।'

স্বামী বলল, 'ওরা আমার কাছে এলে আমি কী করতে পারি?'

---আপনি প্রশ্রয় দেবেন না, আপনি ইমাম সাহেব হিসাবে তাদেরকে নসীহত করবেন। এভাবে পর মেয়েদের সাথে ঢলাঢলি করা কি হারাম নয়?

---মেয়েরা অপর মেয়ের সাথে কথা বলতে দেখলেই স্বামীকে সন্দেহ করে।

---মন্দে পৌঁছনোর আগেই সন্দেহ করাটাই ভাল।

নিছক সন্দেহই নয়, বাস্তব স্বামীর বাহ্যিক চরিত্রের বিপরীত ছিল বলে ভালবাসার বুকে আঘাত হানল। আদর্শ স্বামী হিসাবে তার প্রতি যত শ্রদ্ধা ও প্রেম ছিল, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এবার তো কলহ স্বাভাবিক।

তাছাড়া ইমাম সাহেব আরো একদিন জানতে পারলেন যে, যে ঘর-বাড়ি ও জমি-জায়গা তিনি দেখেছেন, তার মালিক রাজীবরা নয়। আর সেদিন থেকেই তাঁরও মন থেকে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ দূরীভূত হতে লাগল। রানীর সাথে অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার যে আশা বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন, যেহেতু তা পূরণ হওয়ার নয়, সেহেতু এমন মায়া-মরীচিকায় লাভ কী? যে ভালবাসার পশ্চাতে অর্থ নেই, সে ভালবাসা সার্থক নয়। যে বন্ধনের রশি টাকা নয়, সে বন্ধন টিকে না বেশি দিন। যে সম্পর্কের পিছনে সম্পদ নেই, তার সম্পাদন অতি সহজেই হয়।

সুতরাং দুই বৎসর পর ইমাম সাহেব গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করলেন। আর নানা বিপদের মাঝে বোনও এক বিপদ হয়ে রাজীবের গলগ্রহরূপে বাড়িতে চলে এল।

রাজীবের বাড়ির লোক পস্তাতে লাগল। আলেমদের প্রতি বিগড়ে গেল তাদের মতো ভাল মানুষদের সুন্দর মন। বদনাম হতে লাগল পুরো আলেম সমাজ। গ্রামের দুই-এক জন লোক চোর হয়, 'চোর-গ্রাম' বলে বদনাম হয় পুরো গ্রামের। এটাই মনুষ্য-রীতি।

(৭)

এখন শুধু স্বপ্নই নয়, এখন তাকে বাস্তবের জন্যও লড়াই করতে হবে। বাঁচার লড়াই লড়তে হবে। তার মনে হল, পুরো জীবনটাই যেন পাথরে ভর্তি। আর সেই পাথর ভেঙ্গে মহল নির্মাণ করতে হবে। স্বার্থপর বন্ধুরা তার ফুলের মধু চুষে খেয়েছে, বন্ধু বেশে আপন করা আদর্শবান লোকেও তাকে ধোঁকা দিয়েছে, এখন তাকে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু কী অবলম্বন ক'রে দাঁড়াবে সে?

সব বন্ধু যেমন বন্ধু নয়, তেমনি সব বন্ধু স্বার্থপরও নয়। নাজিব নামের এক বন্ধু তাকে পরামর্শ দিল, সে বাংলার বাইরে চলে যাক। বাইরে অনেক কাজ আছে, পয়সাও আছে। অথচ অনেক মানুষ মা বা বউয়ের আঁচল ধরে ঘরে বসে থেকে দুঃখে জীবন-যাপন করছে।

---কিন্তু মা-বাপ বা বউ-সন্তানকে দেখা কি কর্তব্য নয়?

---টাকা ছাড়া সে কর্তব্য পালন হয় না রাজীব। তাছাড়া তোর আব্বা তো এখন বৃদ্ধ হয়ে যায়নি। সে একটা ছোট ব্যবসাও করে। সে কোন রকম সংসার চালিয়ে নিতে পারবে। তারপর সেখান থেকে টাকা পাঠাবি, মাঝে-মধ্যে বাড়ি আসবি, তাতে তারা আরো খুশী হবে রে!

---কিন্তু যাব কোথায়?

---আমার দু'-দু'টো ভাই দিল্লিতে কাজ করে। তুই সেখানে তাদের কাছে গিয়ে ওঠ। কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভারতের রাজধানী দিল্লি। সেখানে আরো কত বাঙালী কাজ করে। কেউ করে সোনার কাজ, কেউ করে পাথরের। যার যেমন যোগ্যতা, যার যেমন ভাগ্য, সে তেমন কাজ নিয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ব্যবসার ঘুম চোখে নিয়ে সে স্বপ্ন তো ভেঙ্গে গেছে। এখন মেহনতের ধুম ও ঘুম নিয়ে সে স্বপ্ন বাস্তব হয় কি না দেখা যাক।

একদিন আল্লাহর নাম নিয়ে মা-বাপ ও বোনের নিকট বিদায় নিয়ে রাজীব বেরিয়ে পড়ল অচেনা পথে অজানা কর্ম-জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সফলতার

সন্ধানে।

বর্ধমান থেকে দিল্লি প্রায় চব্বিশ ঘন্টার পথ। ধর্মঘট, রাজনৈতিক রেল অবরোধ, পকেটমারি, জ্ঞানশূন্য ক'রে সর্বস্ব লুঠ ইত্যাদির আশঙ্কা বুকে রেখে কালকা-মেল ট্রেন ধরল সে। রিজার্ভেশন ছাড়া চালু ডিব্বাতে চড়ে যাত্রীদের সাথে লড়তে লড়তে সফর শেষ করল। রাত্রি ৯টার দিকে দিল্লি পৌঁছলে স্টেশন থেকে অটো-রিক্সা ধরে ঠিকানায় পৌঁছল।

এখন এল নতুন পরীক্ষার পালা। শহরের ঠাসা ভিঁড়ে ভ্যাপসা গরমে তার দম বন্ধ হতে যাচ্ছিল। তার চাইতে বড় মুশকিল হল, যে রুমে তার ঠাঁই হল, সে রুমে কোন রকম পাঁচজন থাকা যায়। কিন্তু তাকে নিয়ে ছয়জন লোক সেখানে রাত্রিবাস করবে কীভাবে? খাওয়ার কাজ সেরে নিয়ে শোবার সময় সবাই চাপাচাপি ক'রে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। তার আর ঘুম হল না।

এখানে বহু লোকের নিত্য-জীবন-ধারা এমনই। সব জায়গায় চাপাচাপি, ঠাসাঠাসি, রেষারেষি। বাথরুমেও লাইন দিতে হয়। অনেকে ভিড় থেকে বাঁচতে কাঠ-টিন দিয়ে ছাদের উপর ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করে। অবশ্য তাতেও টিভি থাকে।

বড় কষ্টের মধ্যে রাজীবের দিনরাত হয়। কাজের খোঁজ করে, কাজ পায় না। সপ্তাহখানেক পার হয়ে গেল। ফোন ক'রে জানা গেল বোন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে এবং তার জন্য ঋণ করতে হয়েছে। সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজতে লাগল। নাজিবের ভাই দু'টিও তারই মতো। তারাও আন্তরিকভাবে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে দেখল। তাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবকেও সন্ধান দিতে বলল। কিন্তু কোথায়?

পনের দিন পার হয়ে গেল, কাজ হাতে এল না। আশাবাদী রাজীব তবুও নিরাশ হল না। পরের দিন সন্ধ্যায় এক গেঞ্জি তৈরীর কারখানায় একটা কাজের খবর পাওয়া গেল আল-হামদু লিল্লাহ।

সেখানে উপস্থিত হয়ে যোগাযোগ করতেই নিয়োগ-প্রাপ্তির আশা পাওয়া গেল। হতাশার অন্ধকার দূরীভূত হল রাজীবের অটল-পাহাড়ের মতো মন থেকে।

কাজ তো আরামের, কিন্তু বেতন মাত্র হাজার টাকা। ম্যানেজার বিহারী। সে মস্ত বড় এক গপে। 'আমার চাচা অমুক অফিসার। আমার মামা অমুক

এম.এল.এ। আমার খালা অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কথায় কথায় রাজীবও পালা দিতে আরম্ভ করল। অবশ্য তার কথায় ম্যানেজার তাকে ঢপবাজই মনে করল।

কাজের তালে তালে নানা গল্প করলে কাজেও বিরক্তি আসে না। তাই ম্যানেজার ঢপ-মার্কা গপ মেরে সকলকে এক প্রকার মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করত। একদিন বিকালে সেসব কথাই চলছিল তাদের মাঝে। এমন সময় দু'জন আর্মি অফিসে প্রবেশ করল। ম্যানেজার-সহ সকলে অপ্রস্তুত অবস্থায় হতভম্ভ হয়ে পড়ল। কী ব্যাপার?

একজন আর্মি জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে রাজীব নামে কেউ আছেন নাকি?'

রাজীব তো আজিব হয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। ম্যানেজারই উত্তর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার! কী ব্যাপার? ঐ যে ঐ ছেলেটা।'

রাজীব উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এল। অবশ্য অপরাধীর মতো তার মনে ভয় ছিল না। বলল, 'আমিই রাজীব স্যার।'

আর্মি বলল, 'কর্নেল সাহেব আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে চলুন।'

রাজীব বুঝে গেল, তার খালুজানই হবেন। জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কোথায়?'

আর্মি বলল, 'পুরনো দিল্লিতে।'

ম্যানেজার যাওয়ার অনুমতি দিলে আর্মির গাড়িতে চড়ে খালুজানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

---কী ব্যাপার! আমাকে কিছু না জানিয়েই দিল্লি চলে এলে?

---কী করব? ভাগ্য টেনে নিয়ে এল। আর আপনি এখানে? আমার ঠিকানা পেলেন কীভাবে?

---হ্যাঁ, বাড়িতে তোমার খবর ও ঠিকানা পেলাম। এখানে বদলি হয়ে এসেছি। ভাবলাম, তোমার সাথে একবার দেখা করি।

রাজীব ফ্লাটে গিয়ে খালার সঙ্গে দেখা করল। তাঁরা সকলেই খুব ভালভাবেই তার আপ্যায়ন করল। চাকরির ঘুমিয়ে পড়া আশা আবার তার মনে পুনর্জাগরিত হল।

(৮)

বেতন যেহেতু অল্প, সেহেতু তলে তলে খোঁজ ছিল অন্য কাজের। এক

সময় রাজীব মারুতির পার্টস তৈরীর ফ্যাক্টরিতে কাজ নিল। বেতন বেশি ছিল, কিন্তু কাজ ছিল বড় কষ্টের। কষ্ট না করলে তো ইষ্ট মেলে না। সে টাকার জন্য তাই করতে লাগল। কাজ করতে করতে তার হাতে ফোস্কা পড়ে যেতে লাগল। একদিন হাতের সেই ফোস্কা খালা-আম্মাকে দেখিয়েও এল। কিন্তু চাকরির ক'রে দেওয়ার ব্যাপারে মুখ খুলতে পারল না। মুখ-চোরামি হয়তো তাকে বাধা দিত নিজস্ব স্বার্থের কিছু বলতে। স্কুলে ভাব-সম্প্রসারণের একটি কবিতা সে বারবার আবৃত্তি করত,

'দৈন্য যদি আসে আসুক লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস,
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।'

তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে হয়তো কারো নিকট ছোট হতে চাইত না। যদিও খালা মায়ের মতোই, তবুও সব খালা তো মায়ের মতো হতে পারে না। খালারা বিয়ের আগে তাকে খুব আদর-স্নেহ করত, আব্বাকেও যথার্থ শ্রদ্ধা করত; বরং ভালও বাসত। কিন্তু তারা যখন বিয়ের পরে ধনী স্বামী পেয়ে বেড়া পার হয়ে গেল, তখন কি আর পিছন দিকে তাকানোর অবসর ছিল? অস্থিতিকালে যে আদরের 'দোলাভাই' ছিল, স্থিতিকালে সে 'ভোলাভাই' হয়ে গেল। দুনিয়ার রীতি এটাই, নদী পার হয়ে মাঝি 'শালা' হয়।

যদিও রাজীব জানে না, তার চাকরি না ক'রে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন অসুবিধা আছে কি না। কিন্তু সে ধারণা করে যে, খালুর ক্ষমতা আছে, অথচ তিনি ইচ্ছা করেই ক'রে দেন না। আর তার জন্যই সে তাঁর কাছে ছোট হতেও চায় না।

ফ্যাক্টরিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। টাকার খাতিরে তা সহ্য ক'রে নিচ্ছিল। বাড়িতে জানতে পারলে আব্বা-আম্মা-বোন সকলেই রাজীবকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করল। যেহেতু তার কষ্টে তারাও কষ্ট পায়, আর সে কষ্ট তাদেরই জন্য।

সুতরাং কিছুদিন পর সে এক বন্ধুর সাথে একটা পুতুল ফ্যাক্টরিতে কাজের খোঁজে গেল। দিল্লিতে বাঙালী মালিকানায় বড় বড় পুতুল ফ্যাক্টরি আছে। সেই সব মালিকরা বড় বড় বিল্ডিং বাড়ি ও গাড়ির মালিক। তবে তারা যে ফ্যাক্টরিতে গেল, তার মালিক মাড়ওয়ারী। সেখানে গিয়ে এক বাঙালী কর্মীর

সঙ্গে পরিচয় হল, তার নামও রাজীব। মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি হিন্দি লিখতে-পড়তে জানো?'

---জানি স্যার।

---কত বয়স তোমার?

---উনিশ বছর।

মালিক অবাক হয়ে তার কোম্পানির রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছ, ওর এখনও মোছও বের হয়নি, আর বয়স উনিশ বছর হয়ে গেছে।'

এ কথার উত্তরে রাজীবের বন্ধু বলল, 'স্যার! ও শৈশব থেকেই ঐ রকমই আছে।'

মালিক হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাদের গ্রামের ছেলেদের শৈশব থেকেই মোছ গজায় বুঝি?'

তার কথা শুনে সকলে হাসতে লাগল। আর সেই সাথে রাজীব কাজটাও পেয়ে গেল। সেখানে তার বেতন হল চৌদ্দ শত টাকা।

মূর্তি ও পুতুল তৈরির কাজ ইসলামে বৈধ নয়। তা না জেনেই রাজীব সেখানে কাজ নিল। সে কাজে সে সুনামও নিতে লাগল। কাজে পারদর্শী হয়ে উঠলে মালিক তার বেতন আঠার শত টাকা ক'রে দিল।

পুতুল ফ্যাক্টরিতে কাজ নেওয়া এক মাস অতিবাহিত হল। এ যাবৎ সে বাড়িতে খোঁজ নিতে পারেনি। মন তো অবশ্যই কাঁদে। আম্মার জন্য প্রাণ কাঁদে, আব্বার জন্যও কষ্ট হয়, বেশি কষ্ট হয় স্বামীহারা স্নেহময়ী বোনটার জন্য। নিজের প্রিয়তমা যেহেতু কেউ নেই, সেহেতু সমস্ত ভালবাসা পাওয়ার একচ্ছত্র অধিকারী তারাই। অবশ্য তার মনটা বড় আবেগময়। তাই তাদের কথা মনে পড়লেই নিজের অজান্তে তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে!

সাইকেল চড়ে ফ্যাক্টরি থেকে বাসায় ফিরার পথে বাড়ির কথা মনে মনে ভাবছিল। ভাবছিল আজ সন্ধ্যায় সে ফোন করবে। কিন্তু সিঁড়িতে উঠেই দেখে, বারান্দায় চেয়ারে একটা লোক বসে আছে, ঠিক যেন তার আব্বার মতো। নাকি সেই তার আব্বা। ভাবল, আব্বা এখানে কীভাবে ও কেন আসবেন? ভালভাবে তাকিয়ে দেখতেই আওয়াজ এল, 'বেটা কেমন আছ?'

সন্দেহের বেড়া ভেঙ্গে গেল। মনের পুলকে সে উত্তর দিল, 'ভাল আছি। আপনি? আপনি এখানে কীভাবে এলেন? ভাল আছেন তো? মা-বোন সবাই ভাল আছে তো?'

---হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে।

---আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ কেন এলেন আব্বা?

---তোমার সাথে শেষ দেখা করতে এলাম বাবা!

---'শেষ দেখা' মানে?

---আমি সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছি, বাকী জীবনটা আজমীর শরীফে কাটিয়ে দেব।

---আর মা, বোন?

---তুমি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব তোমার ছোট মামা নিয়েছে।

রাজীব যেন আকাশ থেকে পড়ল। আব্বা ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু ধার্মিক হওয়ার মানে তো সংসার ত্যাগ নয়। তাহলে মায়ের সাথে কিছু হল নাকি? তাঁর বয়স তত বেশিও হয়নি। তাহলে এখন থেকে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

রাজীব আবার জিজ্ঞাসা করল, 'সংসারে কি অভাব চলছে আব্বা? আব্বা! আমি খেতে পেলে আমার আম্মা-আব্বা সবাই খেতে পাবে। সংসারে কি খাবারের অভাব আছে?'

---না, না। আমি খাজা গরীব-নেওয়াযের সান্নিধ্যে থেকে মরতে চাই।

---তাতে লাভ কী?

---সে তুমি বুঝবে না। তুমি আমাকে তোমার খালার বাসায় নিয়ে চল।

খালার বাসায় গিয়ে কী সব পরামর্শ ক'রে খালুজান রাজীবকে বললেন, 'রাজীব! তুমি তোমার আব্বার সাথে আজমীর চলে যাও। ভাই তো হিন্দী জানেন না। কোথাও হারিয়ে যেতে পারেন।'

রাজীব ফোন ক'রে মালিকের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিল। খালার বাড়িতে গোসল সেরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে বাসায় এসে জামা-কাপড় নিয়ে আব্বার সঙ্গে বের হয়ে গেল নিযামুদ্দীন আওলিয়ার দর্গায়। কারণ সেখানে আগে না গেলে আজমীর যাওয়ার ফল নাকি পাক্কা হয় না। সুতরাং সেখান থেকে স্টেশন বের হয়ে গেল।

ট্রেনে তার মনে পুলক ছিল, গায়ে ধরে না এমন আনন্দ ছিল। এক সময় পৌঁছে গেল আজমীরে, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর মাযারে।

আব্বার মনে যেমন এই জায়গার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তেমনি রাজীবের মনেও ছিল, তবে ততটা নয়। দ্বীনদারীতে রাজীব তখনও কাঁচা।

অবশ্য যে যা বলে, তাতে তার বিশ্বাস করতে বাধে না।

মাযার চত্বরে লোকারণ্যে পৌঁছে রাজীব নিজেকে কত বড় সৌভাগ্যবান কল্পনা করতে লাগল। এই সেই জায়গা, যেখানে এলে নাকি হজ্জ হয়ে যায়। গরীব আর কি মক্কা যেতে পারে? গরীবের হজ্জটা হয়ে যাবে এখানেই। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

রাজীব ও তার আব্বা মিলে যা দেখল,

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

মুসলিম-অমুসলিম সকলের সমাগম।

মাযারের পাশে বাজনা-সহ ভক্তি-গীতি ও কাওয়ালী গাওয়া হচ্ছে।

নারী-পুরুষ মিলে কবরকে সিজদা করা হচ্ছে।

খাজা বাবার কাছে মনের আশা পূরণ কামনা করা হচ্ছে।

কত রকমের নযর-নিয়ায ও উপঢৌকন পেশ করা হচ্ছে।

ফুল ও চাদর চড়ানো হচ্ছে, আগরবাতি জ্বালানো হচ্ছে।

মাযারের তবরুক ও দুআ গ্রহণ করা হচ্ছে।

খাজা-বাবার নামে মীলাদ পাঠ করা হচ্ছে।

সে জায়গা অতি পবিত্র মনে ক'রে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। ফিরে বের হওয়ার সময় পিছু পায়ে বের হচ্ছে।

বিনামূল্যে অন্ন বিতরণ করা হচ্ছে।

যে ডেগে রান্না হয়, সেটা খালি থাকার সময় তাতে যে যা পারছে দান করছে।

দান-বাক্সেও দানের টাকা রাখা হচ্ছে।

মাযারের আশে-পাশে ফুল, চাদর ও সিন্নীর দোকানের জমজমাট।

চত্বরের এক পাশের ছাউনিতে গাঁজার ধোঁয়া উড়ছে এবং সেখানে 'যিগির' হচ্ছে।

মাযার থেকে অনাসাগর এবং সেখান থেকে পাহাড়ের উপর অন্য এক মাযার যিয়ারত ও দর্শন করল। প্রত্যেক স্থানে নানা প্রকার কল্যাণ কামনা করল।

রাজীব যা দেখল, তার সবটাতে বিশ্বাস করতে পারল না। বিশেষ ক'রে সে নিশ্চিত হল যে, এই সব স্থানে কিছু অসাধু লোক রয়েছে, যারা অসদুপায়ে মানুষের অর্থ লুটেপুটে খাচ্ছে।

সকালের দিকে পৌঁছনোর পর সন্ধ্যাবেলায় আব্বা বললেন, 'রাজীব! চল বাবা বাড়ি ফিরে যাই। এখানে আর থাকব না।'

রাজীব তো অবাক! যে মানুষ বাকী জীবন কাটানোর জন্য এ জায়গায় এল, সে মানুষ একটা দিন না কাটাতেই বাড়ি ফিরতে চায় কেন? কোন কারণ জিজ্ঞাসা না ক'রেই মনে মনে আনন্দিত হয়ে সে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। সে তো আব্বাকে ফিরে নিয়ে যেতেই চেয়েছিল।

স্টেশনে এসে প্লাটফর্মের এক সিমেন্টের চেয়ারে আব্বাকে বসিয়ে দিল্লির টিকিট কাটতে গেল রাজীব। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি চেকার এসে তার আব্বাকে টিকিট দেখাতে বলল। দূর থেকে সে লক্ষ্য ক'রে ফিরে এসে বলল, 'কী ব্যাপার?'

---আপনাদের টিকিট দেখান।

---আমরা এখানে নতুন। কাউন্টার খুঁজে বেড়াচ্ছি। ইনি আমার আব্বা। আমরা এখানে সকালে দিল্লি থেকে এসেছি। এই দেখুন টিকিট। এখন ফিরে যাওয়ার টিকিট কাটার জন্য কাউন্টার খুঁজছি।

কিছু সুযোগ-সন্ধানী চেকার আছে, যারা জেনে-শুনে যাত্রীকে খামোখা নাজেহাল করে, অসদুপায়ে অনেক মানুষের অর্থ লুটে খায়। আসার টিকিটটা সাথে সাথে হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর চোখ রাঙিয়ে বলল, 'আপনারা ৫২০ টাকা জরিমানা দিন, না হয় জেলে চলুন।'

রাজীব জরিমানা দিতে রাজি নয়, জেল যেতে তো নয়ই। বচসা করেও কোন ফল হল না। পরিশেষে তার আব্বা বলল, 'জরিমানা দিয়ে দে বাবা! এর মতো পশুর সাথে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই।'

জরিমানা দিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে বসে রাজীব আব্বাকে বলল, 'আচ্ছা আব্বা! গ্রামে শুনেছিলাম, আজমীর শরীফ যারা যায়, তাদেরকে চেকারে ধরে না। আজ তার বিপরীত প্রমাণ হল।'

আব্বা বলল, 'ভক্তির আতিশয্যে অনেকে অনেক কথাই বলে, তার সবটাই কি সত্য হয় বাবা? শুনেছ তো, কা'বা-ঘরের উপর দিয়ে পাখী উড়ে যায় না। কা'বা-চত্বরের পাথর গরম হয় না। দাতা মাহবূবের উরসের মেলায় মাছি, মশা ও কুকুর থাকে না। কিন্তু সেসব কথা সত্য কি?'

---আমি তো ভাবতাম, ওয়াহাবীরাই এ সব কিছু বিশ্বাস করে না। কিন্তু আজ তো আমাকেও বিশ্বাস করতে হল।

---ওয়াহাবীরা তো আওলিয়াই মানে না। কোন কোন কথার ব্যতিক্রম ঘটে বৈকি।

---ফারাযী পাড়ার আমার এক বন্ধু আছে। সে সঊদী আরবে কাজ করে। সে একদিন বলছিল, 'কা'বা-ঘরের উপর দিয়ে পাখী উড়ে যায়, সে নিজে দেখেছে। আর কা'বা-চত্বরের পাথর গরম হয় না। কারণ ঐ শ্রেণীর শ্বেত পাথর প্রকৃতিগতভাবে গরম হয় না।' আর দাতা মাহবুবের উরসের মেলায় মাছি, মশা ও কুকুর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে দেখা না যাওয়ারই কথা। আসলে আমার মনে হয়, 'ঝড়ে কাক মরে, আর ফকীর সাহেবের কেরামতি বাড়ে।'

---ও সব বলতে নেই বাবা! পবিত্র স্থানের মহিমা থাকে বৈকি?

---তা বলে অমূলক মহিমায় বিশ্বাস করা কি ঠিক?

---তা হয়তো নয়। তবে কেরামত তো বিশ্বাস করতেই হবে।

অতঃপর এক সময় ট্রেন দিল্লি এসে গেল। আব্বা দিল্লিতে আরো একদিন থেকে পর দিন দেশে ফিরে গেল এবং পুনরায় পূর্বের মতো কাপড়ের ব্যবসা শুরু করল। সে কথা শুনে রাজীব বড় খুশী হল। কিন্তু আব্বার এই সংসার ছাড়ার ব্যাপারটা তার কাছে রহস্যরূপেই রয়ে গেল।

(৯)

বছর খানেক অতিবাহিত হয়ে গেল। আবেগময় রাজীব তখনও নিজের কথা ভাবেনি। কেবল মা-বাপ ও বোনের কথা চিন্তা ক'রে নিজেকে মশগূল ক'রে রেখেছে। ইতিমধ্যে তার আব্বা তাদের বসত-বাড়ি বিক্রি ক'রে ব্যবসায় টাকা নিয়োগ করেছে। বর্তমানে তারা তার মামার বাড়িতে থাকে। সে যা বেতন পায়, তাতে কোন রকম সংসার চলে। এই যার হাল হয়, তার কি নিজের কথা ভাবা চলে?

কিন্তু মানুষের এমন সময় এসে পড়ে, যখন সে নিজের কথা ভাবতে বাধ্য হয়। অন্যের চাহিদা মিটাতে গিয়ে নিজের জীবনের চাহিদাকে কুরবানী দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এ যাবৎ সে নিজের জীবন-সঙ্গিনীর কথা ভাবেনি, ভাবতে অবসর পায়নি। মায়ের অসুখ ও বোনের পুনর্বিবাহ দেওয়ার চিন্তায় সে ব্যাকুল থাকে। কিন্তু যে দেশে কুমারী মেয়ের বিবাহ দিতে হিমশিম খেতে হয়, সে দেশে তালাকপ্রাপ্ত

মেয়ের বিবাহ কি এত সহজ হয়?

দেশে থাকতে অনেক সহপাঠিনী ও বান্ধবী তার জীবনে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কাউকে নিজের হৃদয়-সিংহাসনে আসন দান করেনি। বড় হওয়ার স্বপ্ন ও সংসার চালানোর দায়িত্ব তাকে এমন বিভোর রেখেছে যে, কোন বন্ধুকেও কোন মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখলে খাপ্পা হয় এবং দূরে থাকতে উপদেশ দেয়।

কিন্তু বয়স চাপতে তার মনের আকাশের পরিবর্তন ঘটল। পরিবেশ তাকে ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

ছুটিতে দেশে গেল। বিয়ে লেগেছিল নাজিবের ভাইঝির। নাজিবের সাথে সেও আমন্ত্রিত ছিল। বিয়ের প্রায় সকল সাজ-সজ্জার দায়িত্ব তাদের দুজনের ঘাড়ে অর্পিত ছিল। বিয়ের দিনে ভাবী নাজিবকে বলল, 'তুমি আর রাজীব মিলে বুশরার বান্ধবীদেরকে ঐ ঘরে খাইয়ে দেবে। খেয়াল করবে, যেন তাদের কোন অযত্ন না হয়। এটা বুশরার অনুরোধ।'

ভাবী চিলকে বিল দেখিয়ে দিল। উভয় তরুণ খুশীর সাথে সে দায়িত্ব পালনের ভার মাথা পেতে নিল। নাজিব রাজীবকে বলল, 'ভাবী দেখছি বিড়ালকে মাছ বাছতে দিল!'

বিয়ে মানেই মেয়েদের মিনা বাজার। 'আমকালে ডোম রাজা, বিয়েকালে মেয়ে রাজা।' চারিদিকে মেয়েদের রাজ-রাজত্ব। আর সেখানে যুবতীদের থাকে চরম আনন্দ, পরম উল্লাস। হাসি-খুশি ও সাজ-গোজে থাকে অপূর্ব প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেখানে নবাগত তরুণ-তরুণীর মাঝে পরিচিতি ঘটে। একে অন্যের প্রতি টীকা-টিপ্পনী কাটাকাটি চলে। আগুনের মুখে বারুদ গিয়ে পড়ে। বাড়ির মুরুব্বীরা সাত কাণ্ড দেখেও না দেখার ভান করে।

বেটা-ছেলে হয়ে মেয়েদেরকে খাওয়াতে হবে! তাতে নাজিবের কৌতূহল থাকলেও রাজীবের কোন আগ্রহ ছিল না। তাকে যেন শুরু থেকেই বিষয়টা লজ্জাকর মনে হল। নাজিব সাহস দিল, উৎসাহ দিল।

নাশ্তার সময় নাশ্তা খাওয়ানো হল। প্রায় আট-দশজন তরুণীর মাঝে মাত্র দুইজন তরুণ। ইশারায়, ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গিতে এবং উঁকি ও উক্তিতে তাদের প্রতি উপহাস ও মস্করা চলতে লাগল। সম্পর্কে 'চাচা' হওয়া সত্ত্বেও নাজিব কারো কারো কথার উত্তর দিল, কিন্তু রাজীব মুখ খুলতে পারল না। তবে সে একজনের হাব-ভাব ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। তার সাথে

তার কথা হল চোখে চোখে। বাতাসে দোলা খোলা চুলের আকর্ষণ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছিল। প্রেমের তুলি দিয়ে রাজীব নিজ হৃদয়ের অঙ্কন-খাতায় তার মোহনীয় ছবি আঁকছিল।

নাশ্‌তা খাওয়ার পর তরুণীরা সকলে বিয়ের কনে বুশরার কাছে গিয়ে বসল। রাজীব আজিব হয়ে ভাবতে লাগল। ভাবল, 'আচমকা-সুন্দরী' হয়তো। পুনঃ দেখার কামনা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। ভাবল, দুপুরে খাওয়ানোর আগে হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু না। তন্বী তরুণীর মাঝে সংসারী কাজের দক্ষতা ছিল। সে ঘুরে-ফিরে ভাবীর সাথে নানা কাজে সহযোগিতা করতে লাগল। সে লক্ষ্য করল, রাজীব তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। আর তার দৃষ্টিতে একটি সকরুণ আকর্ষণ রয়েছে।

দুপুরে খাওয়ানোর সময় রাজীব সেই তন্বীর প্রতি বিশেষ যত্ন গ্রহণ করল। 'মাছ নেবে? গোশ্‌ত নেবে? ভাত নেবে?' বলে তার সাথে বাক্যালাপ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে লজ্জাবতী লতা 'না' ছাড়া কোন কথা বলল না। তবে চোখে চোখে অনেক কথাই বলল। চক্ষু যে প্রেমের ভাষা। সুস্মিত ওষ্ঠাধরে মধুর চমক দিল। হাসি যে প্রেমের ফাঁসি।

বাকী সময়ে রাজীব তার সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করল। বরকনে 'এক-ঠাঁই' করার সময়ও সে তার চক্ষু-সীমানায় অবস্থান করল। বিয়ে বিদায় হলে, সেও চোখে বিদায় দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল।

রাজীবের মনে এবার 'নেশা' ধরে গেল। সেই ছবি বারবার তার মনের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতে লাগল। শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে তার কল্পনা তাকে উদাস ক'রে তুলল।

বিয়ের তিনদিন পর রাজীবকে আনমনা দেখে নাজিব জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বল্‌ তো। তোকে যেন উদাস-উদাস লাগে?'

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে জবাব দিল, 'কৈ না তো! আচ্ছা ঐ মেয়েটার নাম কী রে?'

---কোন্‌ মেয়েটা?

---ঐ যে, যে মেয়েটা আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

---আরে বাবা কোন্‌ মেয়েটা?

---ঐ যে পাতলা, সুশ্রী, চুল খোলা। যার দিকে বারবার তাকাতে তুই আমাকে মানা করছিলি।

---ওহো! ওর নাম শিউলি।

---বাড়ি কোথায়?

---আমাদের গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়।

---চল ওই পাড়া দিয়ে বেড়াতে যাই।

---তুই কি ওর প্রেমে পড়লি নাকি?

---এই ব্যাকুলতার নাম যদি 'প্রেম' হয়, তাহলে আমি প্রেমেই পড়েছি।

---এই মরেছে!

---কী করি বল তো?

---আরে প্রেম কিয়া তো ডরনা কিয়া? বলে ফেল।

---কোথায় বলব? কীভাবে বলব? এ তো শহর নয়। পাড়াগ্রামে কি ফিল্মী অনুকরণ চলে?

---আরে পাড়াগ্রামেও কত ঘটছে। একদম ফিল্মী অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো এ্যাক্‌শন! ঘরে ঘরে টিভি, যখন তখন ফিল্ম্‌ ও নাটক। কী দোস্ত! দিল্লিতে কাউকে পাওনি বুঝি?

---না, ওখানে বাঙালী মেয়ে তত কোথায়? একবার শিউলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দে না!

---ঠিক আছে, কাল চারটার সময় আমাদের ঘরে আসিস।

দেখা হল, কিন্তু কিছু বলার সাহস হল না। রাজীব নাজিবকে বলল, 'তুই বলে দে।'

---ধুৎ! তাই আবার হয়? তুই সরাসরি মুখে বলতে না পারিস, চিঠি লিখে জানিয়ে দে প্রেমের আবেদন।

সুতরাং রাত্রে সে বহু ভাবনা-চিন্তা ক'রে চিঠি লিখল। তবে একটি কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লিখতে পারল না।

প্রথম যেদিন আমি দেখেছি তোমারে,
বেঁধেছি প্রণয়-ডোরে, হৃদয় আধারে---
তুমি যেন আসিয়াছ, করেছ পাগল,
রুদ্ধ করেছ দ্বার, দিয়াছ আগল।
তোমার কোমল হৃদে করিয়া যতন,
রাখিবে আমার প্রেম ফুলের মতন।
প্রেমের পরশ চাহি' করি নিবেদন,

পাইলে তোমায় আমি চাহিব না ধন।

(১০)

প্রেম নিবেদনের ব্যাপারে ছেলেদের জন্য যা করা অতি সহজ, মেয়েদের জন্য তা মোটেই সহজ নয়। কবিতা পড়ে দেহের লোম খাড়া হল শিউলির। মনে মনে সেও রাজীবকে পছন্দ ক'রে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু কবিতার জবাব দেবার মতো সাহস তার হল না। তবে তার হৃদয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। সেও রাজীবকে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিতা হল। ছল-বাহানা ক'রে আসতে লাগল বুশরাদের বাড়ি। কিন্তু হাসি বিনিময় ছাড়া কাছাকাছি হয়ে কথা বলার দুঃসাহস কারো হল না।

চুপে-চাপে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, চাপা বেদনা ছাড়া বাইরে প্রকাশ কিছু হল না। রাজীব সাহস ক'রে আবারও চিঠি লিখে সেই অব্যক্ত বেদনার কথা জানিয়ে দিল।

'শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এল
টগর ফুটিল মেলা,
মালতি লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।'

কিন্তু তোমার খোঁজ আমি কোথায় পাব? কখন তোমার সাথে আমার দেখা হবে? আমার ডাক নাম রাজীব, তার মানে পদ্মফুল। আর তুমি শিউলি।

তুমি থাক ডালে, আমি থাকি খালে,
দেখা কি হবে সেই মরণের কালে?

বল না বন্ধু, 'আমি তোমাকে ভালবাসি!'

তোমার ওষ্ঠাধরে হাসির ঝিলিক এলে তোমাকে ফোটা শেফালিই লাগে। তোমার দর্শন আমার হৃদয়-বাগিচায় প্রেমবারি বর্ষণ করেছে। আমি সাক্ষাতে তোমার সাথে কথা বলতে চাই প্রিয়া! তোমার হৃদয়-বাগানে আমি ফুল ফোটাতে চাই শিউলি! তুমি কি তা চাও না? উত্তর দিয়ো। অপেক্ষায় থাকলাম।

'ইতি'র সাথে প্রীতি দিয়ে শেষ করলাম লেখা,
জানি না গো তোমার সাথে কবে হবে দেখা।

অবশেষে রাজীব শিউলির নিকট থেকে সবুজ-সংকেত পেল। তার বাড়ির এক বালক ভৃত্যের মাধ্যমে চিঠি আসতে লাগল। সাক্ষাৎ হতে লাগল নাজিবের বাড়িতে, স্কুল যাওয়ার পথে। উভয়ের এই অবৈধ প্রেম দ্রুত গতিতে বর্ধিত হতে লাগল। মনে মনে জোয়ার এল, প্লাবিত করতে চাইল নৈতিকতার কূলকে। প্রেম যতক্ষণ অন্তরে থাকে, ততক্ষণ তা পবিত্র থাকে। অন্তর ছাপিয়ে বাইরে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গড়িয়ে গেলেই তা অপবিত্র হয়ে যায়। অবশ্য তারা পবিত্র প্রেমের আনন্দই লাভ করতে চায়।

কিন্তু রাজীবের মনে আনন্দ থাকলেও সে চিন্তামুক্ত নয়। ভাবনা তার ভবিষ্যতের। যে প্রেমে সে পড়েছে, তার ভবিষ্যৎ কী? যার প্রেমে সে পড়েছে, তার অঙ্গীকারের নিশ্চয়তা কী? অর্ধেক পথে তার প্রেম হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে না তো? সে তো ধনী বাপের ধনিকন্যা, তাহলে এ প্রেমের সাফল্যে সে স্বাধীনতা পাবে তো?

প্রেমের সর্বশেষ পরিণাম বিবাহ। বিবাহ ক'রে তার সঙ্গে সুখের সংসার গড়তে পারবে তো? ভালবাসার রঙিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙ্গে যাবে না তো?

বন্ধুদের কাছে পরামর্শ নিয়ে যা স্থির-সিদ্ধান্ত হল তা এই যে, হাতি কিনলে, তার খাবার যোগাতে হবে, বিয়ে করলে তার জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে হবে।

কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ের পথ কী? অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে তার প্রেমও পরিপক্ব হবে, শিউলিও অধিক ভালবাসবে। কিন্তু তার উপায় কী?

দিল্লি যেতে আব্বা বাধা দিয়েছে। তাছাড়া শিউলির প্রেমের টানও তাকে দিল্লি যেতে দিতে চায় না। তাহলে গ্রামে সে করবে কী?

নিজেদের বাড়ি-সম্পত্তি বলতে কিচ্ছু নেই। যেটুকু ছিল চাচারা রেজিস্ট্রি ক'রে নিয়েছে মাত্র ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে। ব্যবসাতে তারা সফল হতে পারল না। আব্বাও না। যেহেতু আব্বা একজন সংসার-বিরাগী মানুষ। সংসারের আয়-উন্নতি তিনি মাথা ঘামান না। তিনি ধার্মিক, ধর্মের খাতিরেও তিনি বাইরে তবলীগে যান।

রাজীব একাকী কী করতে পারে? তার অবস্থা এখন এমন যে, সে যে ডাল ধরে, সেই ডালই ভাঙ্গে। এখন জীবনকে নতুন ক'রে গড়ার জন্য, শিউলির সাথে সুখী সংসার গড়ার জন্য কোন্ ডালের সাহারা সে নেবে? তাকে জীবন-সঙ্গিনী বানিয়ে চিরসাথী ক'রে রাখার মতো সক্ষমতা সে কোথা থেকে পাবে?

আবার রাজীব ছেঁড়া কাঁথায় ঘুম দিয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে লাগল। আত্মীয়রা ধনী। কিন্তু তাদের নিকট থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়ার আশা তো দুরাশা। হতাশার অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজতে লাগল। সে নিজেকে বলতে লাগল,

'আপন কেউ নয় সবাই তোমার পর,
উন্নতি করিতে চাও হও ধুরন্ধর।'

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যতটুকু দ্বীন শিখা যায়, ততটুকু সে জানত। পাঁচ-অক্তের নামায অবশ্য নিয়মিত পড়ত না, পড়া জরুরীও ভাবত না। কিন্তু এ বিশ্বাস তার ছিল যে, আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে চাইলে তিনি দান ক'রে থাকেন। তাই সে নিয়মিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রয়োজন ও আশা পূরণ ক'রে দাও। আমার উপার্জনের পথ খুলে দাও। আমার দাঁড়াবার মতো পায়ের তলায় মাটি দাও, বাস করার মতো বাড়ি দাও। আমাকে একটা দোকান ক'রে দাও। শিউলিকে আমার জীবন-সাথী বানিয়ে দাও। আমার আম্মাকে সুস্থ ক'রে দাও। আমার বোনের একটা হিল্লে ক'রে দাও।' ইত্যাদি।

(১১)

ঘরে বসে না ভেবে এবার রাজীব ময়দানে নেমে পড়ল। চাকরি তার হবে না এবং এটাই তার ভাগ্য বলে মেনে নিল। কিন্তু ব্যবসার ভাগ্যকে সুন্দর করতে সে বিভিন্ন হোলসেল মার্কেট দেখতে লাগল। ব্যবসাকে আরো ভালরূপে বুঝতে লাগল। তার সতীর্থ ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করল। ফেরি-ওয়ালা কাপড়-ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলল। সকলে বলল, 'তুমি দোকান ক'রে যদি সুবিধা দামে মাল সাপ্লাই করতে পার, তাহলে আমরা তোমারই দোকান থেকে মাল নেব।'

সুতরাং তার মনে ঝিমিয়ে যাওয়া আশা আবার ফিরে জাগ্রত হল। পুঁজির জন্য একটা পথই আছে, ব্যাংক থেকে লোন। অতএব সে তার ছোট খালুজানকে সে ব্যাপারে পুনরায় অনুরোধ করল। খালু বললেন, 'তোমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখ। যদি তাঁরা সম্মতি দেন, তাহলে আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।'

এ ব্যাপারে আম্মার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আব্বা সম্মত হলেন না। কারণ

ব্যাংকের লোনে সূদ লাগবে। সুতরাং তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, 'না খেয়ে মরব সেও ভাল, তবুও সূদের উপর ঋণ নিয়ে ব্যবসা করবে না। যেহেতু সে অর্থ হালাল হবে না বাবা!'

আব্বা একজন সংসার-বিরাগী ধার্মিক মানুষ। ইতিপূর্বে তিনি পুলিশের চাকরির সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করেননি। কারণ সে চাকরিতে নাকি তাঁকে ঘুস খেতে হবে তাই!

আব্বার প্রতি রাজীবের শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু এবার তার মনে মনে রাগ হতে লাগল। এটাই কি ধর্ম? ধর্ম কি মাথা উঁচু ক'রে সচ্ছলভাবে বাঁচতে বলে না?

বাধ্য হয়ে সূদের উপর ঋণ নেওয়া কি বৈধ নয়?

ঘুস না নিয়ে কি কোন চাকরি করা যায় না?

সংসার-বিরাগী হওয়া, সংসার ছেড়ে চলে গিয়ে কাশী-বাস করার মতো আজমীর-বাস করাও কি ধর্ম?

বাপ হয়ে বাপের দায়িত্ব পালন না করাও কি ধর্ম?

রাজীবের ইচ্ছা ছিল, এ সব প্রশ্ন আব্বাকে করে। কিন্তু বেআদবীর ভয়ে তা মনেই দেবে রেখে দিল।

বন্ধুদের সাথে পরামর্শ ক'রে আব্বার অনুমতি উপেক্ষা ক'রে লোনের ফরম ফিল-আপ ক'রে দিল। তার ব্যবসার উদ্যোগ দেখে আরও পাঁচজন বন্ধু লোন নেওয়ার দরখাস্ত দিল।

নিয়ম অনুযায়ী আবেদকদের ইন্টারভিউ হবে ব্লক-অফিসে। সর্বপ্রথম বন্ধু জাফর গেল ইন্টারভিউ দিতে। তাকে বি.ডি.ও সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তো বাচ্চা ছেলে, তুমি লোন নিয়ে কী করবে? তুমি ব্যবসা করতে পারবে না।'

সুতরাং ওরটা খারিজ হয়ে গেল। রাজীব গেলে তাকেও একই কথা বলে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন সাহেব। কিন্তু রাজীব বলল, 'স্যার! আমার দরখাস্তটা পড়ে দেখুন। তাতে আমি লিখেছি যে, আমি দীর্ঘ চার বছর ধরে ব্যবসা করেছি। বর্তমানে লোন নিয়ে বড় আকারে ব্যবসা করতে চাই।'

ব্যবসার ব্যাপারে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে তুষ্ট হয়ে সাহেব তার আবেদন মঞ্জুর ক'রে নিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই ব্যাংকের ইনকোয়ারি এল। রাজীব তার খালুর যে রুমে কিছু কাপড় ক্রয় ক'রে রেখেছিল, সেখানে ম্যানেজারকে নিয়ে গিয়ে পুরনো রসিদ-পত্র দেখিয়ে দিল। অফিসার সব কিছু পরিদর্শন ক'রে বললেন,

'যতগুলো প্রার্থীকে লোন দেওয়া হবে, তার মধ্যে পি.এম.আর.ওয়াই (প্রধান-মন্ত্রী রোযগার-যোজনা)এর লোনের আসল হকদার আপনিই। আপনি দোকানের জন্য একটি রুম ঠিক করুন এবং ব্যবসার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিন।'

রাজীব আশ্বাস পেয়ে স্বস্তির শ্বাস নিল। নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোর ঝিলিক দেখতে পেল।

কিন্তু সে আলোও যেন 'আলেয়ার আলো' বলে মনে হল। গ্রাম্য পরিবেশে হিংসার আচরণ বেশি। কিছু লোকের অভ্যাস আছে, যারা অপরের আয়-উন্নতি দেখতে পছন্দ করে না। গরীবরা মনে করে, ধনী আমরা হব, অমুক হবে কেন? আর ধনীরা মনে করে, ধনী আমরাই থাকব, অন্যে মাথা তুলবে কেন? তারা ভাবে, ব্যাংক থেকে লোন তোলা কেবল আমাদের অধিকার। ব্যবসা-বাণিজ্য করার যোগ্যতা কেবল আমাদেরই আছে।

রাজীবের গ্রাম-সম্পর্কের এক মামা ডাক্তারি করে। তার সঙ্গে ব্যাংক ম্যানেজারের বন্ধুত্ব আছে। ম্যানেজার বাবু বন্ধুর স্ত্রীর হাতে ব্রিয়ানী খেয়ে তার ফুসমন্ত্র শুনলেন, 'রাজীব নাকি লোন নিচ্ছে? কিন্তু ওর তো জমি-জায়গা কিচ্ছু নেই। পরিশোধ না করতে পারলে ব্যাংকের বন্ধকী কী?'

ম্যানেজার বাবুর আরো একজনের সাথে বন্ধুত্ব ছিল। তার ছিল গিফটের দোকান। সে বলল, 'ওর চাইতে একটা ছাগলকে লোন দেওয়া ভাল।'

ওদের মন্ত্র কাজে লেগে গেল। ম্যানেজার বাবু রাজীবের নিকট থেকে তাদের বাড়ির দলীল তলব করলেন।

রাজীব বলল, 'বাড়ির দলীল কেন?'

---দলীল মর্টগেজ লাগবে। তবেই লোন পাওয়া যাবে।

---কিন্তু আমরা তো জানি, পি.এম.আর.ওয়াই লোনে কোন মর্টগেজ লাগে না।

---তুমি যে বাড়িটা দেখিয়েছ, সেটা তো তোমার খালুর বাড়ি।

---হ্যাঁ, আসলে ঐ ঘরে আমার কাপড় রাখা ছিল। তাই আপনাকে ওটা দেখানো হয়েছে। বাড়ি দেখাব বলে তো তা দেখাইনি। তাছাড়া সেখানে আমার পুরনো রসিদ-পত্রও ছিল।

---যাই হোক, বাড়ির দলীল নিয়ে এসো। তাছাড়া লোন পাবে না?

---তাই যদি হয়, তাহলে আপনি কি বাকী সকলের নিকট থেকে বাড়ির দলীল মর্টগেজ নিয়েছেন?

---তা কি তোমাকে দেখাতে হবে?

---আমি দেখতে চাই না। তবে আমি জানতে চাই যে, আপনার মর্টগেজ নেওয়ার নিয়মটা শুধু আমার জন্য, না সকলের জন্য। যদি সকলের জন্য হয়, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ আমি আপনাকে ছাড়ব না কিন্তু।

---কী করবে তুমি আমার? আমাকে মারবে?

---আপনাকে মারতে হলে এত বুঝানোর দরকার ছিল না। কলার ধরে যে কোন সময় মারতে পারতাম। কিন্তু আমি অভদ্র নই। জেনে রাখবেন, যদি লোন না পাই, তাহলে হেড অফিস পর্যন্ত আমি যাব। আর আমি এ দেশের নাগরিক, আমি কোন শরণার্থী নই।

---না, না। ঠিক আছে তুমি পাঁচ দিন পরে এসো। আমি দেখছি কী করা যায়।

হয়তো-বা ম্যানেজার ভয় পেয়ে গেলেন। নিশ্চয় তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল। রাজীব মন খারাপ ক'রে বাড়ি ফিরে এল। চলার চালু পথে চলতে চলতে আবার হোঁচট খেল। তাহলে কি তার জীবনে সফলতার কোন আশাই নেই? পড়াশোনাতে অগ্রসর হতে পারল না, চাকরির আশা পেয়েও চাকরি হল না, ব্যবসাতেও অগ্রগতি লাভ করতে পারল না। তাহলে কি তার জীবনে কেবল বিফলতাই সম্বল? সে কি অভিশপ্ত অপদার্থ?

তাহলে কি বড়লোকদের গোলামিই তার শেষ ভাগ্য?

মনকে বুঝায় রাজীব, নিরাশ হয়ো না। নিরাশায় মানুষ মরার পূর্বে মরতে বসে। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

অশ্রু-সজল নয়নে রাজীব পথ চলছিল। পথে যেন তার পা পড়ছে না। প্রতি পদক্ষেপ যেন খালে হচ্ছে। মানুষের প্রতি তার ঘৃণা ও ধিক্কার বেড়ে উঠছে। হায়রে! এইভাবেই তো কত দরিদ্র মার খায়। হতাশার মরু-সাহারায় নিজেকে হারিয়ে দেয়। কত ধনীদের চলার পথে পদপিষ্ট হয়।

কথা অনুসারে পাঁচ দিন পর রাজীব পুনরায় ব্যাংকে এল। মনে নানা চিন্তা, নানা ভাবনা, শঙ্কা ও আশঙ্কা। 'পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।' লোন-দানের পূর্বে ট্রেনিং কোর্স আছে। ডি.এম অফিসে পনেরো দিন ট্রেনিং এবং তার সাত দিন পর টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু যদি ম্যানেজার ট্রেনিং-এর চিঠি না দেন, তাহলে তো লোন পাওয়ার আশা শেষ।

ম্যানেজার বাবুর সামনে এলে তিনি যেন রাজীবকে চিনতেই পারলেন না।

রাজীব তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে বলল, 'স্যার! একটু শুনবেন?'

---কী ব্যাপার? কিছু বলবে?

---স্যার আমার ব্যাপারটা?

---কোন্ ব্যাপার?

---লোনের ব্যাপারটা স্যার!

---ও হ্যাঁ। দলীল এনেছ তো?

---স্যার! আমাদের নিজস্ব বাড়ি নেই। বাড়ি থাকলে অবশ্যই দলীল এনে দেখাতাম।

---তাহলে আমার কিছু করার নেই।

---প্লিজ স্যার! দয়া ক'রে বিষয়টা একটু দেখুন। কাল থেকে ট্রেনিং শুরু। আপনি যদি আজকে পেপারটা না দেন, তাহলে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি একজন বেকার যুবক। বড় আশা নিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি স্যার!

---তোমার কাহিনী শোনার মতো আমার অত সময় নেই। তুমি এখন যেতে পার।

মানুষ নিরাশ হলে মরিয়া ও তেরিয়া হয়ে ওঠে। রাজীবও তাই হল। ক্ষোভে গলা উঁচু ক'রে বলল, 'আপনি নিজেকে কী মনে করেন? আপনি ভুলে যাবেন না যে, আপনি একজন কর্মচারী। আমাদের এই লোন সহজ ক'রে দেওয়া আপনার নৈতিক দায়িত্ব।

---আমাকে তোমার কাছে শিক্ষা নিতে হবে নাকি?

---হবে। কারণ আপনি হয়তো ব্রিয়ানী খেয়ে ভুলে গেছেন পি.এম.আর.ওয়াই লোন লাভের শর্তাবলী কী কী? আমার কাছে জেনে নিন, প্রথম শর্ত ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। কিন্তু আপনি যাদেরকে লোন দিচ্ছেন, তাদের অনেকে মাধ্যমিক পাশ তো দূরের কথা, নিজের নামটাই ঠিকমতো লিখতে জানে না। না কি সে অঞ্চল-প্রধানের ভাই বলে তার পাশের দরকার নেই?

---আস্তে কথা বল। এটা ব্যাংক।

---আর আস্তে নয়। এবার লোককে শুনতে দিন। জানতে দিন আপনাদের মতো মুখোশধারী ভদ্রলোকদের আসল চেহারাটা কী?

---তুমি খুব বেশি কথা বলছ।

---আপনি গরীবের পেটে আঘাত হানছেন, প্রতিঘাত তো সহ্য করতেই

হবে।

ব্যাংকের কর্মচারী ও বহিরাগত লোকেরা তাদের বচসা শুনছে। ম্যানেজার গতিক ভাল নয় বুঝে নিম্নস্বরে বলল, 'তুমি আমার কেবিনে এস।'

রাজীব তাঁর কেবিনে গেলে শান্তভাবে কিছু কথা বলে বুঝিয়ে আগামী কাল আসতে বলল। পরের দিন সকালে গিয়ে হাজির হল রাজীব।

---গুড মর্নিং স্যার! ভাল আছেন?

---একটু বস, আমি লেটার লিখে দিচ্ছি।

রাজীব খুশির সাথে আশাভরা বুক নিয়ে বসল। কিন্তু কতক্ষণ বসতে হবে? বসে থাকতে থাকতে দুপুর বারোটা বেজে গেল। এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল, ম্যানেজার বাবু এক জরুরী কাজে শহরে গেছেন। বিকেলে আসবেন।

তার আজকের ট্রেনিংটা গেল। মনের দুঃখে ও রাগে রাজীব ব্যাংকের পাশেই বসে থাকল। ভাবল, যখন আসবেন, তখনই তাঁকে ধরবে। কিন্তু কৈ? সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেল। তখনও ন্যায়-নীতিহীন ধূর্ত ম্যানেজারের দেখা নেই। অবশেষে সে খবর পেল, তিনি তাঁর বন্ধুর গিফটের দোকানে বসে আছেন।

রাজীবকে দেখেই ম্যানেজার অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তুমি ব্যাংকে চল, আমি এক্ষনি আসছি।'

কিন্তু রাজীব তার এ কথায় সন্দেহ করল। তাঁর মতলব বুঝতে পেরেও রাগ না ঝেড়ে নিজেকে সংযত ক'রে একটু সরে গিয়ে দূর থেকে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখল, ম্যানেজার দোকান থেকে বের হয়ে সামান্য দূরে এক বাড়িতে প্রবেশ করল। সে বাড়ি থেকে আর বের হল না!

রাজীব নাছোড়-বান্দা। এত ধৈর্য কি ধরা যায়? ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। ম্যানেজার বলেই কি সরকারী সম্পত্তিকে নিজের বাপুত্তি সম্পত্তি বানিয়ে তাতে স্বেচ্ছাচারিতার আচরণ করবে? ঘুস, ব্যাকিং, বন্ধুত্ব, পার্টি বা অন্য কোন সোর্স ছাড়া কি কোন নাগরিক নিজের নাগরিকত্বের সামান্য অধিকারটুকুও পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না? এখন সে কী করবে? কার কাছে যাবে? কী ঘুস দেবে? আর কত ভদ্রতা দেখাবে?

রাত দশটা যখন বাজল, তখন ম্যানেজার সেই বাড়ি থেকে বের হলেন। বের হতেই দেখলেন, রাজীব তখনও তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে বললেন, 'তুমি?'

---হ্যাঁ আমি। অবাক হলেন?

---তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ।

---বাড়াবাড়িটা আপনি করছেন না বুঝি? সেই সকাল থেকে ব্যাংকে বসিয়ে রেখে আপনি আমাকে কিছু না বলে শহরে চলে গেলেন। কেন বলুন? দিতেন না, বলে যেতেন। এভাবে মানুষকে হয়রানি করিয়ে আপনি নিজের পরিণাম খারাপ করছেন কিন্তু। দেখুন এ পর্যন্ত আমি আঙ্গুল সোজাই রেখেছি। পরিশেষে ঘি বের করতে আঙ্গুল টেরা করতে হবে কি?

---তুমি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছ?

---হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি।

আবার ম্যানেজার গলা নিচু ক'রে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালে ব্যাংকে এসে পেপার নিয়ে সরাসরি ডি.এম অফিসে চলে যেয়ো।'

---ভাঁওতাবাজি ছাড়ুন। আমাকে এক্ষনি পেপার দিন।

---তুমি কি আমাকে মারতে চাও? তুমি কি সন্ত্রাসী?

---এই আপনাদের মতো বেঈমান ও দেশ ও দশের শত্রুরাই সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে। এখন কী করি বলুন। আমি তো গেছি, এখন আপনাকেও নিয়ে যাব। দেখব, আপনার কোন্ ডাক্তার, না নেতা, না ব্যবসায়ী, না অন্য কোন বন্ধু আমাকে আটকাতে পারে।

ম্যানেজার স্থানীয় এলাকার নন। সুতরাং তাঁর ভয় পাওয়ারই কথা। তাই হুমকি শুনে চমকে উঠে অনুরোধের স্বরে বললেন, 'দেখ রাজীব। কাল সকাল আটটায় এস, আমি তোমাকে পেপার দিয়ে দেব।'

---এক্ষনি চাই। পেপার না দেওয়া পর্যন্ত আমি আপনার পিছু ছাড়ছি না। সেই সকাল থেকে আমাকে বসিয়ে রেখেছেন। আমি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

---এখন এই রাতের বেলায় ব্যাংক খুললে অসুবিধা হতে পারে। তুমি সকালে ডি.এম অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এস, আর অন্যথা হবে না।

রাজীব ধৈর্য ধরে আবারও তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে শেষ বারের মতো অপেক্ষার জন্য বাড়ি ফিরে গেল।

পর দিন সকালে ম্যানেজার নারাজ মনে পেপার প্রস্তুত ক'রে দিলে রাজীব খুশী ও আশাভরা মনে ট্রেনিং-এর জন্য শহরে চলে গেল। অবশ্য যাওয়ার আগে শিউলির কাছেও বিদায় নিতে সে ভুল করেনি।

বড় আনন্দের সাথে রাজীব ট্রেনিং শেষ করল। ফিরে এসে শিউলিকে 'বড় হওয়ার স্বপ্ন' বাস্তব হতে যাওয়ার খবরও বড় আনন্দের সাথে জানিয়ে দিল। আব্বা-আম্মা ও বোনের মনেও আশার আলো দেখা দিল।

(১২)

শত নিরাশা ও দুঃখের মাঝে আব্বা, আম্মা ও বোন সান্ত্বনা দিতে কসুর করেনি। তবে উৎসাহ পেয়েছে প্রেয়সী শিউলির কাছে।

শিউলি ধনী ঘরের মেয়ে। রাজীব গরীব এবং এমন গরীব যে, নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত নেই। আর তার জন্যই রাজীবের মনে বড় সন্দেহ ছিল, শিউলির ডালও এক সময় ভেঙ্গে যাবে হয়তো। তাই প্রেম বাঁধন-হারা হওয়ার আগেই শিউলিকে সে সতর্ক করল। একদিন স্কুল যাওয়ার পথে পথ চলতে চলতে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শিউলি! তুমি কি সত্যই আমাকে ভালবাসো?'

শিউলি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?'

---না, সন্দেহ নেই। তবে আমার ব্যাপারে তোমার সব কথা জানা আছে কি না, জানি না। আমরা খুব গরীব বুঝলে। রোজ আনি, রোজ খাই। এমনকি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নিজের বলে নেই।

---এমন কথা বলো না রাজীব! আমি তো ভালবাসি তোমাকে। তোমার কী আছে, না আছে তা আমার জানার প্রয়োজন কী? তুমি যেখানে থাকবে, আমি সেখানে থাকব। তুমি যা খাবে, আমি তাই খাব। তুমি যদি গাছতলায় বাসা বেঁধে শুকনো রুটি খেয়ে থাকো, তাহলে আমিও হাসি মুখে তাই মেনে নেব। আমি বড় লোকের মেয়ে বলে তুমি ভয় করো না। গরীবের বউ হলে আমি ঠিক পাল্টে যাব। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। জেনে রেখো, চিরদিন আমি তোমারই।

পীরিতের নেশায় এমনই সবাই বলে। শিউলিও তাই বলল। 'পীরিতে মজিল মন, কী-বা হাড়ি, কী-বা ডোম।' জানি না, বাস্তবে সে কথার উপর কতজন প্রতিষ্ঠিত থাকে? তবে মনে হয়, শিউলি পারবে। রাজীবের মনে হল, তারা হয়তো আদর্শ প্রেমের এক ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করতে চলেছে। সে শিউলির কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আবার বলল, 'কিন্তু তোমার আব্বা যদি রাজি না হয়।'

---তবুও আমি তোমারই।

---আমার বড় ভয় হয় শিউলি!

---পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তুমি দোকানটা কর, আশা করি অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

---ঠিকই বলেছ তুমি।

কথা বলতে বলতে পথ চলতে চলতে যমুনা-দীঘির পাড়ে এসে উপস্থিত হল। শিউলি বলল, 'চল, ঐ পাড়ে গিয়ে একটু বসি।'

---তোমার স্কুলের সময় হয়ে যাবে।

এমনিতে কথা বলার সুযোগ নেওয়ার জন্যই শিউলি ঘর থেকে অনেক আগে বের হয়। হাতে আধ ঘন্টা সময় আছে দেখে পথ ছেড়ে বিপরীত পাড়ে গিয়ে এমন আড়ালে গিয়ে একটি গাছের নিচে বসল, যেখানে কোন পথিকের নজর পড়বে না। দীঘিতে পদ্ম ফুল ফুটে তার কাজল বরণ পানিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রে রেখেছিল। রাজীব ছুটে পানিতে নেমে একটি ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে শিউলির পাশে তার মুখের সামনে রেখে বলল,

'মুখের সামনে রাজীব রাখিয়া আজিব হইয়া ভাবি,
তুমি কি পদ্ম অথবা তুমি কি করিতেছ তার দাবী?'

শিউলি জানত, 'রাজীব' মানে পদ্ম। তাই সে বলল, 'তুমি নিজে রাজীব হয়ে আমাকে তার সঙ্গে তুলনা করছ?'

---কিন্তু শিউলিকে দেখে রাজীব তো আজিব হয়ে গেছে!

---আচ্ছা আমি তো তোমার আসল নামটা জানলাম না। নাকি রাজীবই তোমার আসল নাম?

---না, আমার আসল নাম রাজীবুল হক। আর তোমার?

---আমার আসল নাম ইসমত-আরা বেগম।

---বাঃ! বড় সুন্দর নাম। তবে শিউলি তোমার যথার্থ নাম।

---যাঃ! ঠাট্টা করো না। তোমারও তো যথার্থ নাম রাজীব।

---কিন্তু আমার ডাঁটায় কাঁটা আছে। তুমি তুলতে পারবে না।

---ঠিক পারব।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

দু'জনেই মধুর হাসতে লাগল।

শিউলি বলল, 'তুমি বেশ কবিতা বানাতে পার!'

---অভাব যেমন চোর তৈরী করে, তেমনি প্রেম তৈরী করে কবি।

'তুমি আমায় ভালবাস তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ---সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।'

অতঃপর আরো কিছু গল্প ক'রে শিউলি স্কুলে চলে গেল।

(১৩)

আগামী সপ্তাহে লোন তুলে রাজীব ব্যবসায় নামবে। তার আগে সে বেকার যুবকদের মতোই বন্ধুদের সাথে আড্ডা জমায়। বিকেল হলে তাদের স্কুলের গ্রাউন্ডে সকলে মিলে ফুটবল খেলতে যায়। স্কুলটা ঠিক কয়েকটা গ্রামের মধ্যস্থলে। ঐ স্কুলে শিউলি পড়ে, ঐ স্কুলে রাজীবরাও পড়েছে।

বন্ধুদের মধ্যে জাফর ছিল তার খাস বন্ধু। নাজিবের সাথে যেমন তার হৃদ্যতা, তেমনি জাফরের সাথেও তার আন্তরিকতা কম নয়। জাফর তার খালাতো বোন বিউটিকে ভালবাসত। কিন্তু সে কথা জানাজানি হলে বাড়ির লোক তাকে বিরত হতে বলেছিল। কিন্তু সে ছিল নাছোড়-বান্দা। তার প্রেমিকার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। সে চেয়েছিল, স্কুলে গিয়ে তাকে সাহস দেবে, উৎসাহ দেবে। কিন্তু বাড়িতে তার আব্বা-আম্মা বাধা দিল। সুতরাং জাফর ফন্দি ক'রে রাজীবকে বলল, 'তুই আগামী কাল আমাদের বাড়ি যাবি। তাহলে তোর সাথে ঘুরতে বেরনোর অজুহাতে স্কুলে চলে যাব।'

---কিন্তু তোর মা-বাবা তো আমাকে চেনে না।

---সে ঠিক আমি মানিয়ে নেব।

---তোর বাড়িও আমি চিনি না।

---পটলদের মুদিখানার দোকান চিনিস তো? ঐ দোকানে পাশেই দালান-বাড়ি।

কথা অনুসারে পরের দিন সকালে জাফরদের গ্রামে সাইকেল নিয়ে উপস্থিত হল। দোকানের পাশে গিয়ে এক মহিলার সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'জাফরদের বাড়ি কোন্‌টা?'

সে বলল, 'কেন বাবা? কী ব্যাপার? আমি জাফরের মা। কী বলছ বল?'

---আমি জাফরের বন্ধু রাজীব। ওর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

---বাড়ি দিয়ে এসো বাবা!

বাড়িতে প্রবেশ করলে জাফরের সঙ্গে দেখা হল। সে একটি কাজে ব্যস্ত ছিল। তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে দু'তলায় নিজের রুমে পালঙ্কে বসিয়ে বলল, 'আমি বাকী কাজটা সেরে আসছি, তুই একটু বস। পানি খাবি?'

---না, না। তুই আয়।

রাজীব খাটের উপর হেলান দিয়ে বসেছিল। রুমের সৌন্দর্য নিয়ে মনে মনে নিজের ঘর ও রুমের কথা কল্পনা করছিল। কল্পনা করছিল, এমন একটি খাট হলে সে শিউলিকে খোশ করতে পারবে। ইত্যবসরে দেখল, অসতর্ক অবস্থায় এক তরুণী প্রবেশ করছে। তার বুকের ওড়নাটাও ঠিকমত চাপানো নেই। যেহেতু সে জানে না যে, এ রুমে কেউ আছে। প্রবেশ করেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দু'জনেই হতবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। তারপর দু'জনেই এক বাক্যে বলে উঠল, 'তুমি এখানে?'

রাজীব ভাবল, শিউলির বাড়ি এই গ্রামেই। হয়তো সে খবর পেয়ে তাকে দেখা করতে এসেছে। বলল, 'তুমি আমার খবর কীভাবে জানলে?'

---তুমি এখানে কীভাবে এলে?

---জাফরের সঙ্গে। সে আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়ে গেল।

---ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বুঝি?

---কে ভাই? জাফর তোমার ভাই নাকি?

---হ্যাঁ, ঐ দেখ আমাদের যৌথ ছবি, মা, ভাই আর আমি।

পরিচয় পেয়ে রাজীব যেন আকাশ থেকে পড়ল। আর কোন কথা বলল না, যেন বোবা হয়ে গেল। শিউলিও কিছু বলল না।

এরই মধ্যে নিচে থেকে জাফরের আওয়াজ এল, 'রাজীব চলে আয়।'

শিউলির চোখে চোখ রেখে একটু মুচকি হাসি বিনিময় ক'রে রাজীব রুম থেকে বের হয়ে নিচে নেমে গেল।

জাফর তার প্রেমিকার পরীক্ষা দেখতে গেল। স্কুল-ময়দানে একটি গাছের নিচে রাজীব বসে থাকল। তার মনের আকাশে তখন ঝড়-তুফানের কালো মেঘ জমে উঠেছে। মনের দীঘি যেন আন্দোলিত হয়ে উথলে উথলে উঠছে। প্রেমের পথে হয়তো বন্ধুত্বের বাধা কঠোর হয়ে উঠবে। জাফর জানতে পারলে হয়তো ভাববে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তার বাড়িতে আসা-যাওয়া ক'রে সে তার বোনকে ফাঁসিয়েছে। অথচ এ প্রেম তারও আগের। সে হয়তো তাকে বিশ্বাসঘাতক ভাববে। তার সাথের বন্ধুত্ব হয়তো শত্রুতায় পরিণত হবে।

নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল রাজীব, 'বন্ধুত্বের নামে কলঙ্ক তুই। তোর মতো বন্ধুর জন্য সমাজে বন্ধুত্বে কদর কমে যাবে। বন্ধুর প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।'

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। তার মনের আকাশে যে পরিবর্তন ঘটেছে, সে কথা জাফরও বুঝতে পারল। কিন্তু রহস্য রহস্যই থেকে গেল।

ফিরে গেল যে যার বাড়ি। রাজীব খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের রুমে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল। মনে মনে সে তারই এক বন্ধুর কাছে শোনা একটি কবিতা আবৃত্তি করছিল,

'বৃথা আশা, বৃথা চাওয়া, বৃথা এ কামনা,
পৃথিবীতে যাহা চাব, তাহা তো পাব না।
যাহা চাহি আমরা পাই না তাহারে,
শুধু ব্যথা পাই মোরা বুকের মাঝারে।'

সাত-সতেরো ভাবতে ভাবতে সে সিদ্ধান্ত নিল, সে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারবে না। একে তো শিউলি ধনীর মেয়ে, তার উপর তার ভাইয়ের বন্ধুত্ব প্রণয়ের পথে শেওলা হয়ে গেল। এমন পিচ্ছল পথে সে পা বাড়াবে কীভাবে। সুতরাং শিউলির সাথে যোগাযোগ বন্ধ ক'রে দিল। তবে তার জন্য কষ্ট কি আর না হয়? মনের কষ্ট মনের ভিতরেই চেপে রেখে তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

(১৪)

একটি চিত্তাকর্ষক বস্তু থেকে চিত্তকে সরাতে হলে অন্য একটি চিত্তাকর্ষক বস্তু নিয়ে মানুষকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। রাজীব তাই লোন ও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে চোরা মনকে সঠিক পথে ফিরাতে চাইল।

কথা মোতাবেক ব্যাংকে গেল লোনের টাকা তুলতে। কিন্তু বড় হওয়ার স্বপ্নের এ পর্যায়ে এসেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হল। বি.ডি.ও বাবু এক লক্ষ টাকা লোন মঞ্জুর করা সত্ত্বেও ম্যানেজার বাবু চল্লিশ হাজারের বেশি টাকা দিতে রাজি নন। কারণ একটাই, রাজীব নিঃস্ব। ব্যবসায় যদি নোকসান হয়, তাহলে লোন পরিশোধ করবে কীভাবে? সুতরাং আবারও ম্যানেজারের সাথে তার বচসা বাধে। রাজীব বলে, 'দেখুন স্যার! আমাকে মাঝ নদীতে ফেলে দেবেন না।

আমি আপনার কাছে যে ব্যবসা করব বলে আবেদন করেছি, তা হল রেডিমেড কাপড়ের হোলসেলার। তাতে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা ছাড়া চলে না। চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ঐ ব্যবসা শুরু করা যাবে না।'

আরও অনেক পাঁচ কথা হওয়ার পর ম্যানেজার বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি আপাততঃ এই টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু কর। তারপর তোমার ব্যবসায় উন্নতি দেখে তোমার লোনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেব, আমি কথা দিচ্ছি।'

রাজীব আর কোন উপায় দেখল না। ম্যানেজারের কথা মতো সেই টাকা নিয়ে কলকাতায় গেল মাল আনতে। সামনে পূজোর সিজেন পেল। আর তার পরেই ছিল ঈদ। সুতরাং কাপড় ব্যবসার জন্য সেটা ছিল বড় সুন্দর সময়। বাসস্ট্যান্ডে দোকান খুলে বসল সে। দোকানের নাম দিল 'প্রেয়সী বস্ত্রালয়'। যেহেতু উদীয়মান যুবকের মনে-প্রাণে ও কানে তখন প্রেয়সীরই বাঁশি বাজছে। সে নিজেকে শিউলির প্রেম-বন্যা থেকে তুলে বাঁচাতে চাইলেও তাতে তার সর্বাঙ্গ এখনো সিক্ত। যে মনে প্রেম প্রবেশ করেছে, সে মন থেকে প্রেমকে তুলে ফেলা কি এতই সহজ? মন কি কোন শ্লেট বা ব্লাক-বোর্ড বটে যে, যে কোন লেখা তা হতে সহজেই মুছে ফেলা যায়?

শুরু হল 'প্রেয়সী' দোকানের বিকিকিনি। ব্যবসার রমরমা সময়। কচি লাউয়ের ডগার মতো তার ব্যবসা ডাল ধরে উপরে উঠতে লাগল। বত্রিশটি হকার বা ফেরি-ওয়ালা এবং তিনটি দোকানদার ব্যবসায়ী তার হোলসেল দোকান থেকে নিয়মিত মাল নিতে লাগল। গুনে গুনে জমা করতে লাগল টাকা-পয়সা।

যতই ব্যস্ত থাকুক, তারই মাঝে রাজীবের মন পাখি হয়ে উড়ে যেতে লাগল শিউলির ডালে, যেখানে সে উজ্জ্বল ক'রে একাকিনী বসে আছে। ভাবে, তার কথা ভাববে না, কিন্তু মন মানতে চায় না।

'যতনে যাতনা বাড়ে ভালোবাসা এ কেমন,
অনিত্য সে অনুরাগ অশান্তির নিকেতন।'

মজনু লায়লীর বিরহে শোকার্ত হয়ে বলেছিল, 'হে মন! তুমি তো ওয়াদা দিয়েছিলে যে, আমি লায়লীর ব্যাপারে তওবা করলে তুমিও তওবা করবে। আমি তো তওবা করেছি, তাহলে লায়লী নাম শুনে তুমি গলে যাও কেন?!'

আসলেই প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না। প্রেমিক রাজীবেরও স্বস্তি ছিল না।

কয়েক মাস পরে শিউলি হঠাৎ একদিন তার দোকানেই এসে হাজির। ঝলমল নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'কী ব্যাপার তোমার? আজ কয়েক মাস গত হল, কোন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, চিঠি-পত্র নেই, ফোনও কর না। আমার কি কোন ভুল হয়েছে?'

রাজীব জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ভাল আছ তো?'

---ভাল আর কীভাবে থাকব, ভালবাসার আগুনে কাউকে পুড়তে ছেড়ে দিলে কেউ ভাল থাকে কি?

---তুমি আমাকে ভুলে যাও শিউলি!

---কেন? কারণ কী?

---অনেক এমন প্রশ্ন থাকে, যার উত্তর দেওয়া বড় মুশকিল।

---বা-রে! ভালবাসা কোন ছেলে-খেলা নাকি, ইচ্ছামতো ধুলোর ঘর-বাড়ি বানালাম, আর ইচ্ছামতো পায়ে ক'রে ভেঙ্গে দিলাম? একটি হৃদয়ের সাথে আরেকটি হৃদয়ের অটুট বন্ধন, এটা তো কোন ফুলের মালা নয় যে, সহজে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে। কেন ভুলে যেতে বলছ, আমাকে বলতে হবে।

---তাহলে শোনো। আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথাটা যেমন ঠিক, তেমনি তোমার ভাই আমার প্রাণ-প্রিয় বন্ধু, সে কথাটাও ঠিক। এখন তোমার ভাই যদি জানতে পারে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহলে সে কী ভাববে বল তো?

---তুমি আমার ভাইয়ের কথা ভাবছ, আর আমার কথা ভাবছ না? তুমি তোমার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আমার ভালবাসাকে কুরবানী দেবে? তাছাড়া তুমি তো তাকে ধোঁকা দিচ্ছ না। তাছাড়া তার সাথে তোমার বন্ধুত্ব হওয়ার আগে থেকে আমাদের ভালবাসা। তাহলে কুরবানী দিতে হলে বন্ধুত্বকে কুরবানী দাও, ভালবাসাকে কেন? আবার ভাই জানতে পারলে রাজিও তো হয়ে যেতে পারে।

এর জবাবে রাজীব কী বলবে, তা খুঁজে পেল না। একটু নীরব থেকে সে বলল, 'ঠিক আছে। আমাকে সময় দাও শিউলি। তুমি এখন যাও। এখানে তোমাকে আমার সাথে পরিচিত কেউ দেখে ফেললে সন্দেহ করবে।'

---কোন সময় নেই। কোন কথা নেই। জেনে রেখো, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। আর আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে চাই না। যদি তুমি আমাকে উপেক্ষা কর, তাহলে আমি বিষ খাব! আমি তোমার জবাবের অপেক্ষায় থাকলাম।

এই বলে বিগলিত অশ্রু মুছতে মুছতে শিউলি চলে গেল। ডেকে বসিয়ে বুঝাতে পারল না রাজীব, পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়।

সাথে সাথে সে তার বন্ধু নাজিবকে ডেকে পরামর্শ নিল। সে বলল, 'দেখ, একদিকে একটি ফুলের মতো মেয়ের জীবন, আর অপর দিকে তোর বন্ধুত্ব। আশা করি বন্ধুত্বের চেয়ে জীবনের মূল্যটাই বড়। এবার তুই ভেবে দেখ।'

---কিন্তু জাফর কি মেনে নেবে? না মানলে তো সে শত্রু হয়ে যাবে। আর তার পরিণামে হয়তো আমি শিউলিকেও হারিয়ে ফেলব।

---আরে না। শিউলি যখন এমন কথা বলেছে, তখন সে তোকে ছাড়া বাঁচবেও না। তাছাড়া মেয়ের উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছার কাছে সকল বাপ-ভাই পরাজিত। হয়তো ঝুট-ঝামেলা কিছু হবে। তারপর নদীর উপচে-পড়া পানি আবার নদীতেই স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসবে।

সাত-পাঁচ ভেবে রাজীব 'হিরো' সাজার ঝুঁকি নিয়ে শিউলিকে জীবন-সাথী বানাবার সিদ্ধান্ত মনে মনে পাকা ক'রে নিল। সুতরাং সে জাফরের সংসর্গ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল। কিন্তু জাফর যেন তার আরো কাছে আসতে লাগল। তার ব্যবসার আয়-উন্নতি বন্ধু-অবন্ধু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

একদিন সে শিউলিকে জানিয়ে দিল মনের শেষ কথা। 'তুমিই আমার জীবন। তবে অপেক্ষা কর। ভালভাবে মাধ্যমিক পাশ কর। আমি আমার প্রেয়সীকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর পেতে চাই।'

কোনদিন সান্ত্বনার চিঠি লেখে। কোনদিন আবেগময় ভালবাসার কবিতা।

প্রিয়া আমার ভুলো না তুমি
চেয়ে আছি তোমার দিকে,
ভুলে যদি যাও আমারে
রাখব না এ জীবনটিকে।
দিনের শেষে সন্ধ্যা আসে
জানি আমরা সকলে,
প্রেমের পথে দুঃখ আসে
মন ভেঙ্গো না বিফলে।
রাখতে যদি হয় এ জীবন
বাসব ভাল তোমাকে,

ঝড়-ঝঞ্ঝা যতই আসুক
যতই পড়ি বিপাকে।
সকল বাধা লংঘন করি
ধরব আমি তোমার হাত,
সকল কিছু ত্যাজ্য ক'রে
দেব আমি তোমার সাথ।
আকাশ-বাতাস দেখবে শুধু
তুমি আমার শিউলি,
একটি ছোলার ভিতর যেমন
থাকে দু'টি বিউলি।

চিঠি পড়ে শিউলির দেহে শিহরণ জাগে। পাল্টা জবাবে রাজীব উল্লসিত হয়।

'প্রিয়তম! আমি তোমাকে ভুলে যাব---এ কথা স্বপ্নেও ভেবো না। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আমি আমার প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসি। অক্সিজেন ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনি তুমি ছাড়া আমার জীবন বাঁচতে পারে না।'

আর তাতে তাদের প্রেম উথলে উথলে ওঠে। কোন দিন ফোনে কথা হয়, কানে-কানে অতি সংগোপনে। সাক্ষাৎ হয় অতি সন্তর্পণে স্কুলের পথে ও তার দোকানে। অন্যান্য মিলন-ক্ষেত্রও উপেক্ষা করে না। কাছে কোন মেলা হলে মেলা দেখতে গিয়ে উভয়ে সাক্ষাৎ করে। নতুন ফিল্ম্ এলে এক জায়গায় বসে ফিল্ম্ দেখে আসে।

ঈদের দিন গ্রামের মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সালামাল্কি দেওয়ার দিন। সেই সুযোগে শিউলি চলে আসে বাজারে এবং এক ফাঁকে মায়ের বানরসী-পরা রূপে রাজীবের সাথে ছবিও তুলে নেয় স্টুডিওতে।

এমন স্বাধীন পরিবেশই তো উভয়ের প্রেম-বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে বড় সহযোগিতা করেছে।

(১৫)

মেয়ের মতি-গতি আর কেউ লক্ষ্য না করলে মা করে। মা সংসারের রানী। মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী। সেই স্নেহকে ফাঁকি দেওয়া মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। হঠাৎ হঠাৎ সাজগোজ, গোপনে চিঠি লেখা, কাছে এলে কাগজ সরিয়ে ফেলা,

গোপনে ফোনে কথা বলা, সামনে এলে রিসিভার রেখে দেওয়া অথবা বচন-ভঙ্গি বদলে দেওয়া ইত্যাদি সন্দেহের কারণ অবশ্যই বটে। মেয়ের বয়স কম বলেও তো উপেক্ষা করা যায় না। তবুও অনেক উদাসীন 'মা' আছে, যারা মেয়ের সেসব জেনেও না-জানার ভান করে। অথবা উঠতি বয়সের সাময়িক মনোরঞ্জন ভেবে কোন গুরুত্ব দেয় না। অনেক 'মা' তার মেয়েকে বড় 'সতী' মনে করে। নামায ও কুরআন পড়া দেখে ধোঁকা খেয়ে ভাবে, তার মেয়ের দ্বারা কোন অঘটন ঘটতে পারে না। অনেকে ধারণা করে, সে যেমন সতী, তেমনি তার মেয়েও। যেহেতু 'আটা গুণে রুটি, মা গুণে বেটি।' আর এই সব সুবাদেই মায়ের দোষে মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়। অনেক সময় ধারণার বাইরে অসাধারণ ঘটনা ঘটে যায়। আর যখন ঘটে ও রটে, তখন আর সামাল দেওয়া যায় না।

শিউলির মা-ও মেয়ের অস্বাভাবিক হাবভাব লক্ষ্য করেও কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি। অবশ্য মেয়ে তাকে সহজ-সরল ভাবে। কিন্তু মুশকিল হল আব্বা ও ভাই জাফর। তারা দু'জনেই বড় কড়া মানুষ।

এক সাক্ষাতে রাজীব তার ভালবাসার পথ সুগম করতে সেই সমস্যার কথা শিউলিকে জানাল। 'তুমি বড়লোকের মেয়ে। যদি তোমার বাপ-ভাই রাজি না হয়?'

---মা তো অবশ্যই রাজি হবে। বাপ-ভাইকেও আমি রাজি ক'রে নেব। তুমি অত চিন্তা করো না। তুমি এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আমার আব্বা ও ভাইয়ের মুখে তোমার প্রশংসা শুনেছি। আশা করি তারা দ্বিমত করবে না।

পূর্বে মাঝে-মধ্যে জাফরের সাথে রাজীব তাদের বাড়ি যেত। কিন্তু উল্লাসে উন্মাদিনী শিউলির অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য ক'রে বর্তমানে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিল, পাছে জানাজানি হয়ে যায়। জাফর অনেক চেষ্টা করত তাকে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু সে নানা বাহানা ক'রে কাটিয়ে দিত। তবুও জাফরের বাড়িতে রাজীব এখন প্রাত্যহিক গল্প। তাছাড়া জাফরের চাচার সাথেও তার ভাল সম্পর্ক আছে বহু আগে থেকেই। যেহেতু সে বন্ধু নাজিবের দূর সম্পর্কের দোলাভাই। সে পেশায় দর্জি। অনেক খদ্দের সে রাজীবের দোকানে পাঠাত। সে রাজীবকে ভাল ছেলে বলে জ্ঞান করত। সম্পর্কে 'দোলাভাই' বলে হাসি-রহস্যও চলত তার সাথে। সেই চাচাও জাফরের বাড়িতে রাজীবের প্রশংসা-গান গাইত। তাতে শিউলির আনন্দ গায়ে ধরত না। ভাবত, এই

বুঝি ভালবাসা সফল হওয়ার স্বয়ংক্রিয় পথ।

শিউলি সে খবর রাজীবকে পরিবেশন করলে তারও আনন্দিত ও উৎসাহিত হওয়ার কথা। সে ব্যবসায় আরো ভাল ক'রে মন দিল। শিউলিকে সাথীরূপে পাওয়ার আশা তাকে আরো বড় হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগল। তার দোকান রমরমিয়ে চলতে লাগল।

রাজীবের ব্যবহার বড় অমায়িক। ভদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে এলাকার অধিকাংশ মেয়েরা তার কাছে মাল নিতে আসত। তাছাড়া সে দোকানে বসে মাল নিত না, বরং স্বয়ং নিজে কলকাতা গিয়ে মাল নিয়ে আসত। আর তার ফলে সে অন্য দোকানের তুলনায় কম দামে মাল দিতে পারত। চেষ্টা রাখত, নতুন নতুন মডেল ও ডিজাইন তার সংগ্রহে আসুক। আর তাতে আধুনিকারা তার দোকানে এসে কাপড় কিনত। আর তার ফলে তার বড় হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব হতে লাগল।

বাজারের অন্যান্য দোকানের তুলনায় তার দোকানের গ্রাহক বেশি, বেচা-কেনাও বেশি। লাভও ভাল হয়। ব্যাংকের কিস্তীও ঠিকমতো পরিশোধ করতে লাগল। আর তার ফলে ম্যানেজার তাকে ভালবাসতে লাগলেন। যেহেতু ঐ দলের সে ছাড়া অন্য কেউ ঠিকমতো কিস্তী দিতে সক্ষম হয়নি।

যখন কারো নাম হয়, তখন সবচেয়ে বেশি খুশি হয় সে, যে তাকে ভালবাসে। জীবনের সাফল্যের পথে আজ বড় ব্যবসায়ী রাজীব। এ কথা শুনে শিউলির সবচেয়ে বেশি খুশি। অবশ্য এ সাফল্যের মূলে হাত রয়েছে তারই ভালবাসা। তারই ভালবাসা তাকে এত ভালভাবে ব্যবসা করতে প্রেরণা যোগায়।

(১৬)

রাজীবের মুদ্রা এখন সচল। চারিদিকে আনন্দের হাতছানি ছিল। মায়ের স্বাস্থ্যও এখন মোটামুটি সুস্থ। আব্বাও ব্যবসা ক'রে সংসার চালাচ্ছেন। দুশ্চিন্তা বলতে কেবল তালাকপ্রাপ্ত বোনটাকে নিয়ে।

রাজীব তাকে খুব ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। এরই মাঝে বর ঠিক ক'রে তার ধুমধামের সাথে পুনর্বিবাহ হয়েছে। কিন্তু 'জিসকো না দে খোদাতালা, উসকো না দে সকে আসেফুদ্দৌলা।' সে স্বামী নিয়েও সে সুখী হতে পারেনি। যেহেতু সে মদ্যপ এবং তার জেরে সে বোনকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত। কিন্তু

বোনের শ্বশুর---তার ব্যবহার ও কাজ-কর্মের জন্য প্রচুর ভালবাসত। কিন্তু তাতে কী হয়। যার জন্য সংসার, তার ব্যবহার যদি ভাল না হয়, তার ভালবাসা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে নানা সুখের মাঝেও সে সংসার জাহান্নাম।

তাদের অবস্থাও সচ্ছল নয়। বোন অসুস্থ হলেই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আর তার সমস্ত খরচ রাজীবকেই বহন করতে হত। অবশ্য সে খরচ করতে সে কার্পণ্য করে না। তাছাড়া মা-ও একটি মেয়ে বলে দুই হাতে তাকে অনেক কিছু দিয়ে থাকে।

অবশ্য দোলাভাইয়ের সাথে রাজীবের সম্পর্ক ভালোই আছে। সে তাকে মদ্যপান ছাড়ার ব্যাপারে বারবার অনুরোধ করে। স্বাস্থ্য নষ্ট ও অর্থের অপচয় সহ সামাজিকভাবে মানুষের নিকট ঘৃণ্য হতে হয় মদ্যপানে। সুরা হল যাবতীয় অপরাধের প্রসূতি। সে কথা সে মানলেও সঙ্গদোষে লোহা ভাসে। এভাবেই টানে ও ঠেলায় চলে যায় তাদের সংসার।

ইতিমধ্যে আর একজন বন্ধু রাজীবের জীবনে এল। সে এল.আই.সি-র একজন এজেন্ট। সে বুদ্ধি দিল, 'তোর দোকান এত সুন্দর চলে, কিন্তু তুই সবই খরচ ক'রে দিস। ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা কর।'

সুতরাং তার কাছে সে পলিসির গ্রাহক হল। কিন্তু এ কারবারে যে সূদ আছে, সে কথা রাজীবের আব্বা জানতেন। তার কাছে খবর গেলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। কিন্তু যুক্তির বহরে জিতে গিয়ে রাজীব তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করল না। তখনই তিনি তাকে বলেছিলেন, 'আবারও তুমি সূদী কারবারে জড়িয়ে পড়লে। ঘরে সূদ ঢুকলে ধ্বংস আসে। বেশি লোভ ভাল নয় বাবা!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? প্রায় সকল মানুষই জানে ব্যাংকের সূদ সূদ নয়, ব্যবসার লভ্যাংশ। আর বহু মানুষের আয়-উন্নতি ব্যাংকের সাথেই জড়িত। পরন্তু এ কথা বিদিত যে, অবৈধ পথেই কালো টাকা আসে বেশি।

(১৭)

রাজীব দোকানে ছিল। এমন সময় পাশের দোকানে ফোন এল তার।

---হ্যালো! কে?

---ভাল আছ? আমি শিউলি বলছি।

---আল্লাহর রহমতে ভালই আছি। কী ব্যাপার?

---আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয় না?

---ইচ্ছা হলেই তো হয় না। সব ইচ্ছা কি পূরণ হয়? দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে সময় ক'রে উঠতে পারি না। তুমি পারলে দোকানে কাপড় কেনার নাম ক'রে চলে এসো।

---না, তুমি এসো। আমার ফুফাতো বোন শামীমা এসেছে। তাকে তোমার কথা শুনালে সে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাচ্ছে। প্লিজ এসো না একবার।

---না, না। আমি পারব না। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ি আমি যাব না। তাছাড়া তোমাদের বাড়ি গেলে জাফর আমাকে সন্দেহ করতে পারে। সে বলতে পারে, 'বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের ক্ষতি করছে।'

---বেশ তাহলে রাখছি। ভাল থেকো।

এমন সময় নাজিব এল দোকানে। বসার পর সে বলল, 'রাজীব! তুই কি জানিস প্রধানের ভাগ্নের সঙ্গে জাফরের সম্পর্ক?'

---হ্যাঁ, ওরা পরস্পর ভাল বন্ধু।

---ও শিউলির সাথে প্রেম করার চেষ্টা করছে।

---ও চাইলেই কি হবে? শিউলি তো চাইবে না।

---সমস্যাটা ওখানে নয়। আসলে ওরা জেনে ফেলেছে শিউলি তোকে ভালবাসে। তাই ওরা তোর পিছনে লাগার জন্য মিটিং করেছে। সব সময় কেউ না কেউ তোর গতিবিধি লক্ষ্য করছে। সুতরাং তুই সাবধানে থাকবি, আর শিউলির সঙ্গে দেখা করার মোটেই চেষ্টা করবি না। ওরা খুব বদমাশ! বর্তমানে ওদের হাতে ক্ষমতা আছে। দেখিস না ওদের ক্ষমতার অপব্যবহার? সামান্য দোষে মারধর করে!

---যা হবে সময়ে দেখা যাবে।

এরই মধ্যে একটি ছোট বাচ্চা দোকানে উপস্থিত। রাজীব তাকে চেনে না। তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে রাজীবকে দিয়ে বলল, 'শিউলি ফুফু এটা আপনাকে দিয়েছে।'

হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাল বিলম্ব না ক'রে সে চলে গেল।

রাজীব শিউলির চিঠি খুলে পড়তে লাগল। অন্যান্য খবরের সাথে লেখা আছে, 'আগামী মার্চ মাসের ৩ তারীখে আমি আমার মামার বাড়ি যাব। তুমি

সকাল দশটায় ঐ গ্রামের বাস স্ট্যাণ্ডে আমার সাথে দেখা করো।'

সে তারীখ আসতে এখনও প্রায় এক মাস বাকী। প্রিয়ার সাথে দেখা হবে, সেই খুশিতে কত শত কল্পনার সাগরে সে হাবুডুবু খেতে লাগল।

মনের আকাশে সেই খুশির ঝড় ছিল। প্রকৃতির আকাশেও মেঘ জমে বৃষ্টি নামল। এ যেন রোমান্টিক প্রেম-কল্পনার সাথে প্রকৃতির স্বাভাবিক মিল!

তখন রাত প্রায় ৮টা। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। এমন সময় সাইকেল নিয়ে জাফর এসে হাজির। কী ব্যাপার? কোন খারাপ সংবাদ নয় তো? সে আবার তাদের ভালবাসার কথা জেনে ফেলেনি তো? নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে সে অবাক হয়ে বলল, 'কীরে জাফর! এ বৃষ্টিভেজা রাতের বেলায় তুই?'

---হ্যাঁ, এক বস্তা ইউরিয়া কিনে দে তো। সঙ্গে টাকাও নেই। কাল তোকে দিয়ে দেব।

'অসুবিধা নেই' বলে সারের দোকানে গিয়ে দু'জনে ইউরিয়া কিনে সাইকেলে চাপিয়ে নিল।

বৃষ্টির রাত। তখনও মেঘ সরেনি আকাশ থেকে। চারিদিক অন্ধকার ছেয়ে আছে। জাফরের গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা পাকা হলেও সামনের কিছু দেখা যায় না। আবার ওদের বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথ কাঁচা। তখন সেখানে কোন টলি বা রিক্সাও নেই। অবশ্য তার সাথে টর্চ আছে। কিন্তু টর্চ জ্বালিয়ে সাইকেল সামলানো বড় অসুবিধে। সুতরাং সে রাজীবকে বলল, 'তুই তো এখন দোকান বন্ধ করবি। অতএব চল না আমার সাথে টর্চ দেখিয়ে।'

রাজীব শিউলির কথা মাথায় রেখেই বলল, 'না, না, আমি যাব না। আমি বাড়ি যাব।'

---বড় অসুবিধায় পড়ব। কাল ভোর সকালে সারটাও জরুরী। চল না সাথে।

---তাহলে স্কুল মোড় পর্যন্ত যাব।

---বেশ তাই চল।

কিন্তু স্কুল মোড় পার হতে গিয়ে জাফর আবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল, 'চল না আর এইটুকু। কাঁচা রাস্তায় আরো অসুবিধা।

---তাহলে পটলদের দোকান পর্যন্ত যাব।

---বেশ তাই চল।

দোকান পর্যন্ত গিয়ে জাফর বলল, 'বাড়ির কছে এসে তুই যদি চলে যাস, তাহলে কত খারাপ দেখায় বল তো? তাছাড়া আমার আব্বা-আম্মা যদি জানতে পারে যে, তুই দরজার কাছ থেকে ফিরে গেছিস, তাহলে তারা কী ভাববে বল তো? চল বাড়ির ভিতরে চল, খেয়ে-দেয়ে যাবি।'

জোর ক'রে জাফর তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। বাড়ি ঢুকতেই দেখতে পেল, শিউলি ও তার আব্বা-আম্মা দাওয়ায় বসে আছে। সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে সলজ্জ পদ-বিক্ষেপে জাফরের সাথে দু'তলায় চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাজীব বুঝতে পারল, জাফর তাকে পরিকল্পিতভাবে খাওয়া-দাওয়া করানোর জন্যই বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

অবশ্য শিউলি মুখ খোলেনি। তবে তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা গেল। মনে হয় সে জানত না যে, রাজীব তাদের বাড়ি আসবে।

খাওয়ার সময় জাফর সঙ্গে ছিল। শিউলির মা বেড়ে বেড়ে বড় আপ্যায়নের সাথে খাবার তুলে দিচ্ছিল। নানা কথার মাঝে বলতে লাগল, 'তুমি আমাদের বাড়ি আস না কেন বাবা? তোমাকে কি লজ্জা লাগে?'

রাজীব সংকোচ-জড়িত কণ্ঠে বলল, 'না, আসলে দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকি তো।'

---বেশ বাবা! সময় পেলে এসো মাঝে মাঝে। জাফর তোমার খুব নাম করে।

মনে মনে রাজীব এত খোশ হল যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাবল, এ তো মেঘ না চাইতেই পানি। তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের ভালবাসার কথা আঁচ ক'রে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছে। এ তো বিনা যুদ্ধে কেল্লা ফতে হয়েছে! আল-হামদু লিল্লাহ!

কিন্তু রাজীবের সে ধারণা ভুল ছিল। আসলে জাফরই বন্ধুত্বের সুবাদে তার সে খাতির তারা সেদিন করেছিল। নচেৎ তাদের ভালবাসার সম্পর্ক তাদের নিকট তখনও অবিদিত। কিন্তু 'শাঁখা-হাতী শাঁখা নাড়ে, বিড়াল বলে ভাত বাড়ে।'

(১৮)

অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মার্চের তিন তারীখ এসে উপস্থিত হল। সকাল নয়টায় দোকান বন্ধ ক'রে রাজীব শিউলির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার

জন্য বাসের অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তার এক বন্ধু এসে বলল, 'শিউলি ওর মামার বাড়ি যাচ্ছে, এ কথা (প্রধানের ভাগ্নে) শফিকুল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জানতে পেরে তোদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। ওদের মনে যে সন্দেহ ধরেছে, তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ওরা তোদের পিছন করতে পারে। তুই শিউলিকে দেখা করতে যাস্ না।'

কিন্তু রাজীব মানবে না। দেওয়া কথা না রেখে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কীভাবে? তাছাড়া শিউলিও তো সেখানে গিয়ে তার অপেক্ষায় বসে থাকবে। সুতরাং শিউলি যে বাসে গেল, তার পরের বাসে রাজীব গিয়ে শিউলির মামার শহরের বাস-স্ট্যান্ড ও কলেজের নিকট মিলিত হল। একটি গাছের নিচে বসে তারা গল্প করছিল। তখনই রাজীব জানতে পারল, শিউলির বাড়ির লোকে এখনও তাদের ভালবাসার ব্যাপারে অবগত নয়।

ইতিমধ্যে আবার ঐ বন্ধু পরের বাসে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তাদেরকে খুঁজে বের ক'রে জানিয়ে দিল যে, 'ওরা তোর দোকান বন্ধ দেখে হয়তো এখানে এসে যাবে এবং তোকে মারধর করতে পারে। সুতরাং তোরা সরে যা।'

সুতরাং রাজীব শিউলিকে বলল, 'তুমি মামার বাড়ি চলে যাও, বিকাল চারটায় এখানে দেখা করব।' তারপর সে নিজে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে বোনের বাড়ি চলে গেল। সে তার দোলাভাইকে ঘটনা খুলে বললে সে উত্তেজিত হয়ে তার মস্তান বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে শফিকুলের দলকে শায়েস্তা করার উদ্যোগ নিল।

রাজীব দেখল, মারপিট হলে ব্যাপারটা জানাজানি হবে এবং থানা-পুলিশ হলে ঘি-ভাতে ছাই পড়ে যাবে, সুতরাং দোলাভাইকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত করল।

ওদিকে শফিকুলের দল তাদেরকে না দেখতে পেয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

বিকাল চারটায় রাজীব-শিউলি আবার মিলিত হল কলেজ চত্বরে সেই গাছটির নিচে। সেটা একটি পার্কের মতো। অনেক স্বামী-স্ত্রী ও প্রেমিক-প্রেমিকা সেখানে বেড়াতে আসে। সেখানে তাদের অনেক গল্প হল, মনের কথা, প্রেমের কথা বলে মন খোলাসা ক'রে নিল। ঘন্টা খানেক পর সে শিউলিকে বলল, 'আমার বোন তোমাকে দেখতে চেয়েছে। যাবে আমার বোনের বাড়ি?'

---তুমি নিয়ে গেলে আমার কোন আপত্তি নেই।

গল্প করতে করতে বোনের বাড়ি এল। বোন দেখে খুব খুশি। আনন্দের

সাথে বলল, 'আমি জানতাম, আমার ভাইয়ের পছন্দ মন্দ হতে পারে না।'

গল্পের সাথে চা-নাশ্‌তা ক'রে সন্ধ্যার বাসে শিউলি বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা জানাল, কারণ সে মামাকে তাই বলে এসেছে। সুতরাং রাজীব তাকে বাসে চাপিয়ে দিয়ে ফিরে গেল বোনের বাড়ি এবং সেখানে রাতটা থেকে সকালের বাসে বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতেই থাকল সে। দোকান খুলতে গেল না। তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ বাবা! দোকান খুলতে গেলে না?'

---হ্যাঁ, একটু গা জ্বর-জ্বর লাগছে।

দুপুর দুটোর সময় নাজিব এসে বলল, 'রাজীব! আজ তুই বাজারে যাস্ না। কারণ আজকে ওরা তোকে মারার পরিকল্পনা ক'রে রেখেছে। জাফরকেও ওরা বুঝিয়েছে যে, তুই নাকি গতকাল শিউলিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলি। ওরাই তোদেরকে বাধা দিয়েছে। এখন জাফরও তোর প্রতি আগুন।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আরও এক বন্ধু কালাম এসে উপস্থিত হল। সামনে রাজীবের মা-কে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চাচী! রাজীব কোথায়?'

রাজীবের মায়ের সন্দেহ হল, ছেলের কিছু একটা হয়েছে। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে বাবা!? প্রথমে নাজিব, তারপর তুমি তার খোঁজ নিয়ে পরপর এলে? কিছু হয়েছে নাকি?'

---না, চাচী! হয়নি কিছু। আসলে আজ ও দোকান খোলেনি তো। তাই খবর নিতে এলাম।

---কিন্তু তোমাদের চেহারা বলছে, কিছু একটা হয়েছে। তোমরা গোপন করছ।

---না, না, কিছু হয়নি। কই ও?

---ভিতরে আছে, দেখো।

কালাম বলল, 'আজকে তোর বাজারে না যাওয়াই ভাল। আমরা তেঁতে ওঠা ব্যাপারটাকে ঠান্ডা করি, তারপর তুই দোকান খুলবি।'

কিন্তু রাজীব বলল, 'না-রে! আজ না হয় কাল দোকান খুলতেই হবে এবং তাদের সামনে পড়তেই হবে। সুতরাং আজই গিয়ে দোকান খুলব। যা হবে, দেখা যাবে। তাছাড়া ওরা যেটা রটিয়েছে, সেটা মিথ্যা। আর আমি আজকে দোকানে না গেলে ওরা সুযোগ পেয়ে বলবে, "দেখছিস কথা সত্য। তাই ভয়ে

রাজীব দোকান খোলেনি।” তোরা তো আমার পাশে আছিস।'

সকলে একমত হয়ে বলল, 'তাহলে তাই হবে।'

বিকাল চারটায় তিনজনে বাজারে গিয়ে দোকান না খুলে একটি ফাঁকা জায়গায় ঘাসের উপর বসল। কিছুক্ষণ পর তারা লক্ষ্য করল, আশে-পাশে ঘুরে-ফিরে তারা জোট বাঁধছে, কানাকানি করছে। কিন্তু সামনে আসছে না।

এক পর্যায়ে সন্ধ্যা নেমে এল। নাজিব গেল সেলুনে দাড়ি কাটতে। অন্য বন্ধুটিও উঠে কোথায় গেল। রাজীব চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে লাগল। সেই সময় ঐ চায়ের দোকানের পাশে ঐ বদমাশদেরকে আসতে দেখে সে বিপদের এক সঙ্কেত পেল। দুই মিনিটের ভিতরে জাফর এসে হাজির হল। সরাসরি তার কাছে এসে বলল, 'রাজীব! তোর সাথে আমার কথা আছে।'

জাফরের চোখ-মুখ দেখে বুঝা যাচ্ছে, সে রাগে মাতাল হয়ে আছে। রাজীব বলল, 'ঐ দিকে ফাঁকা জায়গায় চল।'

দু'জনে ফাঁকা একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাদেরকে পনের-ষোল জন যুবক ঘিরে ফেলল। রাজীব একটা ফোনের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। জাফর তাকে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তোর সাথে শিউলির কী সম্পর্ক আছে?'

রাজীব পুতুলের মতো নীরব-নিথর হয়ে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকল। জাফর আবারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। রাজীব তখনও চুপ থাকল। পাশ থেকে শফিকুল বলে উঠল, 'শালা সহজে মুখ খুলবে না। ঘা দিলে তবেই খুলবে।'

তখন রাজীব বলল, 'জাফর আর আমার মাঝে কথা হচ্ছে, তুই তাতে নাক গলাবি না।'

---আমাদেরকে জাফর নিয়ে এসেছে।

রাজীব বুঝতে পারল, তার মস্তানিতে জাফরের সম্মতি রয়েছে। সে বলল, 'তোরা এতজন মিলে আমাকে ঘিরে রয়েছিস। আমি ভয়ে মিথ্যা বলতে পারি। আমার সাথে তোর বোনের কী সম্পর্ক, সে কথা তো তোর বোনকে জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে যেতিস।'

---তুই বল, তুই ওকে ভালবাসিস কি না?

---হ্যাঁ, আমি ওকে ভালবাসি। ভালবাসি এবং ভালবাসব। তোরা পারিস তো আটকে দে।

এমন সময় রাজীবের সপক্ষে কালাম-সহ তার বন্ধুরা এসে উপস্থিত হল। নাজিব বলল, 'জাফর! এভাবে রাজীবকে শাসানোর কোন অর্থ হয় না। ওদের ভালবাসাতে তোর সম্মতি না থাকলে তুই তোর বোনকে গিয়ে বুঝা। ও যদি যোগাযোগ না রাখে, তাহলে রাজীবও রাখবে না।'

রাজীব জাফরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'এদের কথায় কান দিয়ে তুই আমাকে ভুল বুঝলি। তুই নির্জনে এসে ব্যাপারটা আমার কাছে জানতে পারতিস।'

জাফরের আগুন যেন স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু শফিকুলের আগুন তখনও তেজ ছিল। সে বলল, 'আমাদের গ্রামের মেয়ের সাথে অন্য গ্রামের ছেলে এসে প্রেম করবে, তা আমরা দেখতে পারব না। এরপর যদি তোকে আমাদের গ্রামে দেখি, তাহলে তোর পা কেটে ফেলব!'

রাজীব বলল, 'নিজের বোগলটা আগে শুঁকে দেখ। তোরা যখন অন্য গ্রামের মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করিস, তখন সেটা অন্যায় নয়? আমি তোদের গ্রাম কালকেই যাব, পারলে আমার পা কেটে নিস।'

পাশ থেকে অন্য একজন গুণ্ডা বলল, 'কাল তোকে শহরে পেলে ওখানেই মেরে ফেলতাম। তোর ভাগ্য ভাল যে সরে গিয়েছিলি।'

---কেন? এখানে আজকে মারতে কী অসুবিধা আছে? আর জেনে রেখে দে, আমাকে এখানে মারলে মারতে পারিস, ওখানে নয়। কারণ ওখানে আমার কে আছে, তা তোদের অজানা নয়। আর এটাও জেনে রাখিস যে, আমার গায়ে হাত তুললে তোদের এলাকা থেকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

কালাম বলল, 'জাফরদের আপোসের ব্যাপার। ওদের ব্যাপার ওদেরকে মিটিয়ে নিতে দে। তোরা কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস?'

বদমাশের দল বুঝতে পারল, রাজীব একা নয়, তার সাথেও লোক আছে। সুতরাং তারা ধীরে ধীরে কেটে পড়ল।

বাড়িতে ফিরে গিয়ে জাফর যথারীতি বোনকে শাসন করল। অতঃপর তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে লাগল। রাজীব-শিউলির সাক্ষাতের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য মন ও ফোনের লাইন তখনও কেউ বন্ধ করতে পারেনি। যে নদীর বাঁধের প্রতি বর্ষার আগে ও বর্ষণের শুরুতে নজর দেওয়া হয়নি, সে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পর কি আর তার উত্তাল পানিকে

আটকে রাখা সম্ভব?

(১৯)

বড় হওয়ার স্বপ্নে আবার বাধা পড়ল রাজীবের। দোকান তার ভালই চলছে। কিন্তু ঠিকমতো মাল সাপ্লাই দিতে পারে না। তার জন্য দরকার বেশি মালের, বেশি টাকার। একদিন ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারকে বলল সেই বকেয়া লোনের কথা, 'স্যার আপনি বলেছিলেন, ব্যবসা ভাল চললে লোনের টাকা বৃদ্ধি ক'রে দেব। আপনি আমার ব্যবসা দেখছেন। খদ্দের দোকান থেকে ফিরে যাচ্ছে, মাল দিতে পারছি না। বাকী টাকাটা না পেলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।'

---হ্যাঁ, আমিও সে কথাই ভাবছিলাম। তুমি এই ফরমগুলিতে সই ক'রে দাও। দশ-পনের দিনের ভিতরে টাকা পেয়ে যাবে।

ফরমে সই ক'রে আসার পর এক সপ্তাহ কেটে গেল। হঠাৎ ব্যাংক থেকে ম্যানেজার বাবু ডেকে পাঠালেন।

---কী ব্যাপার স্যার? ভাল আছেন?

---ভাল আছি, কিন্তু মন খারাপ।

---কী হয়েছে স্যার?

---আমি বদলি হয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কলকাতায় পোস্টিং হয়েছে। আগামী কাল আমি ওখানে চলে যাচ্ছি। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম। তোমার সমস্ত পেপার্স আমি কমপ্লিট করেই রেখেছি। নতুন ম্যানেজার বাবুকে আমি বলে যাব, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। দেখবে, তাড়াতাড়ি টাকাটা পেয়ে যাবে।

'ধন্যবাদ' দিয়ে রাজীব ফিরে এল। কিন্তু আবার কোন দুশ্চিন্তা তার মাথায় অনুপ্রবেশ করল। পরিচিত ম্যানেজারের সাথে তো যুদ্ধ ক'রে কিছু পাওয়া গিয়েছিল। এখন আবার অপরিচিত নতুন ম্যানেজারের সাথে কী করতে হবে, তার ঠিক নেই। না জানে আবার তার উন্নতির পথে কোন অন্তরায় এসে চলার গতি রুদ্ধ ক'রে দেয়। এ যেন, 'হাভাতে ফকীর হল, দেশেও মন্বন্তর এল।'

আশা ও আশঙ্কায় দিন কাটতে লাগল। ব্যাংকে নতুন ম্যানেজার এসে

উপস্থিত হলেন। কাল বিলম্ব না ক'রে রাজীব ব্যাংকে গিয়ে হাজির হল। ম্যানেজারকে সে সব কথা খুলে বলল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার ফাইল দেখেছি। কিন্তু তার ভিত্তিতে অতিরিক্ত লোন দেওয়া যাবে না। আপনি বরং অন্য একটা লোন নিন।

---তা কীভাবে?

---মর্টগেজ দিয়ে।

---কিন্তু স্যার! মর্টগেজ দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই। তাছাড়া আমি এক লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র চল্লিশ হাজার লোন পেয়েছি। বাকী ষাট হাজার টাকার ব্যাপারে আগের ম্যানেজার বাবু বলেছিলেন, পরে দেব। এখন তিনি বদলি হয়ে চলে গেছেন এবং পেপার্স রেডি ক'রে আপনার উপর সে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

---আমি জানি। উনি থাকলে দিতে পারতেন। কিন্তু আমার পক্ষে তা দেওয়া অসম্ভব। আমি আপনার রেপুটেশন দেখে ডাইরেক্ট লোন দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে মর্টগেজ লাগবে। অথবা যে চাকুরিজীবি এই ব্যাংক থেকে বেতন তোলে, সে যদি আপনার গ্যারেন্টার হয়, তাহলে আমি দু'দিনের ভিতরে আপনাকে লোন দিতে পারব, তাছাড়া নয়।

রাজীবের তো মাথায় হাত! সে কোথায় পাবে মর্টগেজ, আর কোথায় পাবে গ্যারেন্টার? সুতরাং তার আর লোন নেওয়া হল না।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মাথায় এই দুশ্চিন্তা তাকে আরো বিপর্যস্ত ক'রে তুলল। শিউলি ফুলের সুগন্ধও হয়তো চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, এদিকে বড়লোক হওয়ার স্বপ্নময় আশারও হয়তো নিশাবসান হতে চলেছে।

আব্বা-আম্মা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে তার বড় স্বপ্নের কথা জানাজানি হল। ধনী আত্মীয়রা তার সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করার অফার দিল। অনেকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনভেস্ট ক'রে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর ব্যবসায় শরীক হতে চাইল। কিন্তু দুর্দম যুবক তাদের সামনে মাথা ঝুঁকাতে প্রস্তুত হল না।

এখনও তারা মামার বাড়িতে বাস করে। একান্ত কাছের বলতে মামারাই। সেই সময় তার ছোট মামা চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হল। তার কাছে মায়ের মাধ্যমে খবর গেলে একদিন সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা হলে তোর দোকান ঠিকমতো চলবে?'

---ব্যবসা বড় করতে গেলে ২/৩ লাখ টাকা। আর মোটামুটি চালাতে গেলে এক লাখ তো লাগবেই।

---আমি টাকা দেব। কিন্তু আমাকে অর্ধেক লভ্যাংশ দিতে হবে।

মামার বাড়িতে বাস ক'রে কি তার সামনে মাথা উঁচু করা যায়? রাজীব সেই শর্তে রাজি হয়ে গেল। সাথে সাথে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে দোকানে মাল তুলল। ব্যবসা আবার ভালরূপে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

রাজীব তার মামাদের কাছে বিশ্বস্ত ছিল। যৌথ ব্যবসা শুরু করার পরেও সেই বিশ্বস্ততায় ব্যবসা চলতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে পূজো ও ঈদ এসে উপস্থিত হবে। রাজীব মামাকে বলল, 'এই সময় এক লক্ষ টাকার মাল তুলে রাখতে হবে। তাহলে পরবের সিজেনে অনেক লাভ করা যাবে।'

কিন্তু হিসাবী মামার মনে অন্য রকম ফন্দি এসে গিয়েছিল। সে বলল, 'আমি যখন তোমার সাথে ব্যবসায় যোগ দিলাম, তখন কত টাকার মাল ছিল?'

---আটান্ন হাজার আট শ' টাকার।

---আমি তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছি। তাহলে এখন আর আট হাজার আট শ' টাকা দেব।

রাজীব স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকে উঠে বলল, 'মামা! আপনার কি এই কথা ছিল?'

---দেখ রাজীব! লাভ যখন সমান সমান, তখন পুঁজিও সমান সমান হওয়া উচিত।

রাজীব থমকে গেল, নির্বাক ও হতবাক হল। বলতে গিয়েও আশ্রিত হয়ে বলতে পারল না যে, আমি যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করছি তার বিনিময় কী? তাহলে আমার একটা বেতন হওয়া উচিত। তাছাড়া মহাজনের দোকান থেকে যে ধার-বাকীতে মাল আনা হয়, তারও হিসাব হওয়া উচিত।

সে মনের কথা মনেই চেপে রেখে দিয়ে বলল, 'তাহলে ব্যবসার অনুকূল এ মৌসমে মাল তুলব কী দিয়ে?'

---আমি টাকা দিতে পারি। কিন্তু ব্যাংকের হিসাব অনুপাতে ইন্টারেস্ট লাগবে!

চতুর মামার কথা শুনে রাজীব মনে মনে দুঃখ পেল, কিন্তু তা তাকে বুঝতে

দিল না। সে সম্মতি দিয়ে বলল, 'তাই হবে। আপনি টাকা দিন।'

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে আপন মামাও পাশে দাঁড়াল না। লাভের লোভ তাকে আত্মীয়তার কথা বিস্মৃত করল। মনে মনে রাজীব ভাবল, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব একটি বড় অভিশাপ। আর সেই অভিশাপ দ্বারা ফায়দা লুটে অর্থলোলুপ লুঠেরারা। লুঠেরা কি ঘর-পর জ্ঞান রাখে?

আশ্রিত ভাগিনেয় আশ্রয়দাতা মামার নিকট সূদের উপর টাকা নিয়ে মাল তুলে ব্যবসা চালাতে লাগল।

(২০)

দোকানে বসে ছিল রাজীব। হঠাৎ জাফর এসে বলল, 'কেমন আছিস রাজীব?'

---ভাল আছি। তুই কেমন আছিস?

---ভাল। সেদিনকার ঘটনায় আমি দুঃখিত। আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম।

---ছাড় ওসব কথা। যা হয়ে গেছে, তা বয়ে গেছে।

পুনরায় জাফর রাজীবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক ক'রে নিল। কিন্তু রাজীব তাকে উপেক্ষা ক'রে চলার চেষ্টা করত। জাফর ভাবল, তার বোনের সাথে রাজীবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তাদের প্রেমের অবারিত স্রোতোধারা যে অন্তঃসলিলা নদীর মতো প্রবহমান ছিল, সে কথা সে জানত না।

বহু দিন বিনা যোগাযোগে কেটে গেল শিউলি-রাজীবের। নিশ্চয় কেউ কাউকে ভুলে যায়নি। বরং প্রেম-শাস্ত্রের কথামতো 'প্রেমে যত বাধা পড়ে, প্রেম তত বাড়িয়া চলে'র নীতিতে তাদের প্রেম বর্তমান ও বর্ধমান ছিল।

একদিন বাজারে শিউলির ফুফু ও ফুফাতো বোন শামীমার সঙ্গে রাজীবের দেখা। কুশলাদি বিনিময়ের পর শামীমা তাকে বলল, 'শিউলি বড় কষ্টে আছে। সে তোমার জন্য পিঞ্জারাবদ্ধ পাখির মতো ছটফট করছে। তুমি তাকে যেভাবে পারো, সান্ত্বনা দিয়ো।'

গভীর রাত্রে রাজীব শিউলির কথা ভাবতে ভাবতে একটি কবিতা লিখল,

যদি বল, তোমার তরে ঝরায়ে আমি রুধির ধারা,
লাল গোলাপটি এনে তোমার হাতে দেব প্রিয়-হারা!
যদি বল, এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকারে,

সাজিয়ে দেব নিজ হাতে তোমার সোনার দেহটারে।
যদি বল, দূর আকাশের চন্দ্র আমি আনব তুলে,
তোমার ঘরে সাজিয়ে দেব, জ্যোৎস্নালোকে শিউলি ফুলে।
যদি বল, সুখের স্বর্গ গড়তে পারি এক নিমেষে,
যদি বল, জীবনটুকু দিতে পারি সর্বশেষে।
যদি বল, করব আমি স্বর্ণ খাঁটি ভবের মাটি,
রক্ত দিয়ে লিখতে পারি জীবন-সেরা কবিতাটি।

কোনভাবে রাজীব পৌঁছে দিল স্কুলের পথে শিউলির হাতে। তা পড়ে শিউলির চোখ অশ্রু ঝরাতে লাগল। সে কবিতা সে তার চাচাতো বোন চামেলি এবং ফুফাতো বোন শামীমাকে দেখাল। তারা পড়ে বলল, 'শিউলি! এ কবিতা পড়ে ঐ কবির প্রেমে পড়তে আমাদেরই ইচ্ছা হচ্ছে! কী ভাগ্য রে তোর?'

দেখতে দেখতে কুরবানী এসে গেল। লুকিয়ে-ছুপিয়ে টেলিফোনেও তাদের যোগাযোগ হতে লাগল। একদিন রাজীব শিউলিকে জানাল, 'কুরবানীর পরের দিন আমি শহরে সার্কাস দেখতে যাব। তুমি পারলে চলে এসো। আমি তোমার জন্য সেখানে ১০টার সময় অপেক্ষারত থাকব।'

এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু শিউলি যাবে কীভাবে?

একটাই পথ আছে, মামার বাড়ির যাওয়ার পথ। মাঝে যা হবে হোক, শেষে অংকে মিলে গেলেই হল।

একজন বান্ধবীকে সাথে ক'রে শিউলি বাস-যোগে মামার বাড়ি গেল। কিন্তু তার আগে আবার বাস ধরে তারা রাজীব ও তার দোলাভাইয়ের সাথে চলে গেল অন্য শহরে সার্কাস দেখতে। শিউলি বলল, 'যে ক'রেই হোক তাকে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে হবে মামার বাড়িতে। নিরাপত্তার খাতিরে আমার এই বান্ধবীকে পাঠিয়েছে সাথে।'

সার্কাস দেখা হল, কিছু খাওয়া-দাওয়া হল, অনেক গল্প-কাহিনী বলা হল, মন ফ্রি হল। কিন্তু মামার বাড়িতে ফিরার পথে শেষ বাসটি ফেল হয়ে গেল। এখন কী হবে?

সকলে ফাঁপরে পড়ল। কাল সকাল ছাড়া ফিরার কোন উপায় নেই। এখানে থাকবেই বা কোথায়? বাড়ির লোকে যদি মামার বাড়িতে টেলিফোন ক'রে তাদের খোঁজ নেয়, তাহলেই বা কী হবে?

রাত্রি বাস করার জন্য সে শহরে রাজীবের খালাতো বোনের বাড়ি যেতে পরামর্শ দিল তার দোলাভাই। কিন্তু তা মনঃপূত হল না সকলের। যেহেতু দু-দুটো অপরিচিত তরুণী নিয়ে তাদের বাড়িতে ওঠা ঠিক মনে হল না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিল, তারা হোটেলেই থাকবে। অতঃপর সকালে ফার্স্ট-বাস ধরবে।

এক লজে গিয়ে দুটো রুম নিল। এক রুমে দুই তরুণী, অন্য রুমে রাজীব ও তার দোলাভাই। তবুও কি নিরাপত্তা আছে?

লজের কর্মীদেরকে ভয় আছে। সুন্দরী তরুণী দেখে তারা গোলমাল পাকাতে পারে। যেহেতু এই সকল লজে সাধারণতঃ প্রেমিক-প্রেমিকারা রাত্রিবাস ক'রে ফূর্তি মেরে যায়। বেশ্যাবৃত্তিও চলে। আর তার জন্যই মাঝে মাঝে পুলিশে লজ রেড ক'রে তল্লাশিও চালায়। সুতরাং তাদের দুশ্চিন্তায় ঘুম না আসারই কথা।

কিন্তু ঘুম আসার আগেই দরজায় করাঘাত করল দুই বান্ধবীতে। তারা বলল, 'তাদের দরজায় কে যেন করাঘাত করছিল। আমাদেরকে ভয় লাগছে। রাজীব আমাদের রুমে এসো।'

রাজীব বুঝল না ব্যাপারটা। রুমে ডেকে নেওয়া আসলেই কি ভয় দূর করার জন্য, নাকি তার সঙ্গে আরো কিছু গল্প-আমোদ করার জন্য। দোলাভাই বলল, 'তাই যাও।'

রুমের মাত্র দু'টি বেড। এক বেডে রাজীব এবং অন্য বেডে দুই সখীতে রাত্রি-যাপন করল। সে রাতটি ছিল শিউলির প্রেমের অভিযানপূর্ণ স্বপ্নসম। নানা ভয়ের মাঝে প্রেমিককে হাতের কাছে পাওয়ার চরম আনন্দ তার মনে-প্রাণে। পরে যা হয় হবে!

সকালে শিউলির বান্ধবী বলল, 'আর মামার বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। চল আমার বোনের বাড়ি যাই। সেখান থেকে বোনকে পটিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোদের বাড়ি ফিরে যাব, তাহলে বাইরে রাত্রিবাসের সন্দেহটা দূর হয়ে যাবে। আর বকুনিও খেতে হবে না।'

দারুণ বুদ্ধি! এই না হল ছলনার ললনা। তারা তাই করল। আর রাজীব দোলাভাইয়ের সাথে বোনের বাড়ি চলে গেল।

বোনের বাড়িতে রাজীব বড় টেনশনে ছিল। আবার হয়তো গতবারের মতো 'পালিয়ে যাওয়া'র বদনাম ছড়াবে। এমনটা কেন হয়? যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই কেন সন্ধ্যা হয়?

কোঠার উপরে বসে রাজীব দুশ্চিন্তায় মন ভারি ক'রে বসে আছে। এমন সময় দোলাভাই এসে উপহাস ছলে বলল, 'বড় মজা নিয়ে রাত কাটালে, আর এখন টেনশন করছ?'

রাজীব জোর দিয়ে বলল, 'দোলাভাই! আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। তাছাড়া সঙ্গে আরো একটা মেয়ে ছিল।'

কিন্তু দোলাভাই বিশ্বাস করতে পারল না। সে ভাবল, তারা ঐ মজা করার জন্যই ছল ক'রে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রুমে।

রাজীব তার চরিত্রের পবিত্রতা প্রমাণ করতে একটা উদাহরণ পেশ করল। মনে করুন, একটা শিশু ডিম দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসে। অতঃপর তাকে মাছ-মাংস ও ডিম দিয়ে ভাত দেন। দেখবেন, সে মাছ-মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে নেবে এবং ডিমটাকে রেখে রেখে সবশেষে আস্তে আস্তে খাবে। কারণ সে ডিম খেতে সত্যই ভালবাসে। খাওয়া শেষ করার আগে কোন মতেই সে ডিম খেয়ে শেষ করবে না। তেমনি কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে সত্যিই ভালবেসে থাকে, তাহলে সে বিয়ের আগে কোনদিন তাকে নষ্ট করবে না। আর আমি শিউলিকে সত্যিই ভালবাসি। তাকে আমি নষ্ট করতে পারি না।

বিজ্ঞগণ বলেন, 'প্রেম আর কামনা হল দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। আর কামনা হচ্ছে সাময়িক উত্তেজনা।' রাজীবের সে উত্তেজনা ছিল না। সে কথাই সে দোলাভাইয়ের নিকট প্রকাশ করল।

(২১)

দুপুরে বোনের হাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজীব বিকালে বাড়ি ফিরল। প্রবেশ করতেই দেখল, অনেক আত্মীয়-স্বজন জমা হয়েছে বাড়িতে। সকলের চাহনিতে যেন ধিক্কারের তীর। মা বলল, 'কাল থেকে কোথায় ছিলি?'

---বোনের বাড়ি। কেন?

মামী বলল, 'আর নাটক না ক'রে ঠিক ক'রে বল। মেয়েটাকে কোথায় রেখে এসেছ?'

রাজীব অবাক! কীভাবে জানল এরা?

নানী বলল, 'চুপ তোরা! আমাকে বলো তো ভাই, ব্যাপারটা কী? আমরা সবাই দুশ্চিন্তায় আছি। সত্যি ক'রে বলো কী হয়েছে?'

রাজীব নীরব দাঁড়িয়ে থাকল। সাথে সাথে তার দূর সম্পর্কের এক দোলাভাই তাকে বাইরে পুকুরের পাড়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এখানে সকালে বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে এবং পুরো গ্রাম রটে গেছে। তুমি নাকি জাফরের বোনকে নিয়ে পালিয়ে গেছ। ওরা মনে হয় থানায় কমপ্লেন করেছে। মেয়েটা নাকি নাবালিকা। এখনও আঠার বছর বয়স হয়নি। আর এই সুযোগে শফিকুলের পার্টি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মারার জন্য। এখন তুমি সত্য ক'রে বল, ঘটনাটা কী? আর লজ্জা ক'রে লাভ নেই। হাটের মাঝে যখন হাঁড়ি ভেঙ্গেই গেছে, তখন আর গোপন করবে কীভাবে?'

রাজীব তখন মূল ঘটনা খুলে বলল।

কিন্তু শিউলি তখনও বাড়ি ফেরেনি। বোকা মেয়ে বাড়িতে ফোনও করেনি। ভেবেছিল, ডুবে জল খেয়ে কাপড় না ভিজিয়ে পাড়ে উঠে আসবে। কিন্তু অবৈধ প্রেম করে হয়তো দু'জন, পরন্তু দেখে বহুজন। সমাজের জাগ্রত চক্ষু থাকে তাদের ঐ অস্বাভাবিক আচরণের ঘটন-অঘটনের উপরে। অনেক সময় যা ঘটে, তা সাথে সাথে রটে। আবার অনেক সময় তা রটে, যা আসলে ঘটে না।

তাছাড়া ঐ প্রেমের অংশী থাকলে অথবা ঐ প্রেমিকার প্রতি অন্য কোন যুবকের লালসা থাকলে অথবা তাদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকলে তাদের ঘটনা ঘটানো হয়, রটানো হয় বেশি। আর এই কৌতূহলে এক প্রকার তৃপ্তি আছে, যা প্রেমিক-প্রেমিকার ঘটনা রটনা ক'রে উপলব্ধ হয়।

শিউলি নিজ বান্ধবীর সাথে তার বোনের বাড়ি থেকে সকালে নিজ বাড়ি ফিরতে পারেনি। বাড়ির লোক ফোন ক'রে মামার বাড়ি থেকে জেনেছে শিউলি সেখানে যায়নি। ওদিকে রাজীবের দোকান বন্ধ। তার মানেই ধারণা পাকা যে, তারা দু'জনে এক সাথে উধাও হয়েছে।

আসলে শিউলির বান্ধবী বোনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু তার দোলাভাই ঘরে ছিল না বলে বোন স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর ছেড়ে বের হতে পারেনি। ফলে তারা ওখানেই আটকে ছিল।

ঘটনার বাস্তবিকতা জানানো হল জাফরদের বাড়িতে। জাফর নিজে সেই গ্রামে গিয়ে বোন ও তার বান্ধবীকে নিয়ে এল। তারা জানল, তারা কাল থেকে সেখানেই ছিল। আবারও সাপের মাথায় জড়ি পড়ল। লজ্জিত হল জাফর ও তার বাড়ির লোক।

কিন্তু তা হলে কী হবে। 'মায়ের পোড়ে, না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে। যার গরু সে বলে বাঁঝা, আর পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন! কাক খায় কাঁঠাল, আর বকের মুখে আঠা!' শফিকুলের দল বিষয়টিকে বিরাট ক'রে পাকিয়ে তুলল। তার লালসা ছিল শিউলির প্রতি, বাঘের মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাই তার এত আক্রোশ রাজীবের প্রতি। সে ছাড়বে না। প্রয়োজন হলে রাজীবকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে!

পরন্তু থানায় ডায়েরি ক'রে থাকলে পুলিশও আসতে পারে ঘরে। সুতরাং পাঁচ রকম ভয় ও আশঙ্কায় রাজীবের আব্বা রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতের অন্ধকারে গোপনে প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে পুনরায় মেয়ের বাড়িতে রেখে এলেন। তিনি একাই রাতারাতি বাড়ি ফিরলেন! ছেলেটাকে তো বাঁচানো যাবে। ভুল করল একজন, এখন ভুগতে হল গোটা পরিবারকে।

ওরা বলে, 'প্রেম করা দোষের নয়, সমাজ-ব্যবস্থা দুষ্ট।' তাহলে দুষ্ট সমাজে প্রেম করাই বা কেন? এই অস্বাভাবিক আচরণ ছাড়া কি পৃথিবীর কোন দম্পতি সুখী হয় না? স্বাভাবিকভাবে সমাজ মতে বিবাহিত দম্পতির জীবনে কি প্রেমের জোয়ার আসে না? যুবক-যুবতীরা নেতিবাচক ধারণা করে। আসলে ছবি দেখে হিরো-হিরোইন হওয়ার শখ জাগে। কিন্তু অধিকাংশই 'হিরো' হতে গিয়ে 'জিরো' হয়ে যায়। সিনেমায় পরিচালক শত আপদ-বিপদে 'হিরো-হিরোইন'কে বাঁচিয়ে নিয়ে প্রেমের সফলতা প্রদর্শন করে, গুলাগুলিতে সকলে গুলি খেয়ে মরে, কিন্তু তারা মরে না। এটা তো কাল্পনিক সংঘটিত ঘটনা। বাস্তবে কে কাকে বাঁচাবে?

তবুও বলতে হবে, রাজীবের সপক্ষে লোক আছে। আর তাদেরই সহযোগিতায় এখনও হিরোর ভূমিকায় কাজ ক'রে যাচ্ছে।

বোনের বাড়িও নিরাপদ নয়, যেহেতু সকলেই চেনে সে বাড়ি। সুতরাং ভোরে ভোরে দোলাভাই তাকে রেখে এল এক বন্ধুর বাড়িতে। সে ট্রাক-চালক, সে প্রায় সময় বাইরে থাকে। বাড়িতে তার আব্বা থাকে এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে তার স্ত্রীও থাকে। তারা সকলেই ঘটনা শুনে আফসোস করতে লাগল।

বাড়ির মহিলাটি রঙে কালো হলেও মনের দিক দিয়ে খুব ভাল। সে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সম্ভবতঃ তার বিয়েও ছিল প্রেম ক'রে। সে তার নিজের এবং অন্যের অনেক অভিজ্ঞতা ও প্রেমের পথে অনেক কাঁটার কথা শুনাল।

কিন্তু রাজীবের মনের টেনশন গেল না। দুশ্চিন্তায় ঠিকমতো আহার-নিদ্রা করছিল না।

একদিন বাড়ির মুরুব্বী রাজীবকে বাইরে ডেকে গরুর খড় কাটতে কাটতে বলল, 'বাবা রাজীব! তুমি একটা মেয়ের জন্য এত ভাবছ কেন? তুমি কি সত্যিই তাকে ভালবাস? তাহলে চিন্তা করো না। আমরা আছি, আমরা তাকে বাড়ি থেকে গাড়ি ক'রে তুলে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব।'

এ কথাগুলি ছিল সাহসী লোকের। এমন সাহসের কথা শুনে রাজীব মনে যেমন একটু সান্ত্বনা পেল, তেমনি ভয়ও পেল। এই বৃদ্ধ লোকটি যদি এমন কথা বলে, তাহলে নিশ্চয় এরা বিপজ্জনক লোক। আর ট্রাক-ড্রাইভার তো মদ খেতই। একদিন তার সাথে ট্রাকে মালদহ গিয়ে ভাল অভিজ্ঞতাও হল। তারা এমন লোক হলে যে কোন সময় তাদের বাড়িতেও পুলিশ আসতে পারে। আর চোরের মন পুলিশ-পুলিশ। সুতরাং একটা বাহানা বানিয়ে সে খালার বাড়ি বর্ধমান চলে গেল।

(২২)

শিউলির বাড়ির লোকে থানায় অভিযোগ করেনি। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা আছে, এমন কেস-লড়াইয়ে সাধারণতঃ মেয়ে পক্ষ জিততে পারে না। যেহেতু মেয়েই তাদের বিপক্ষে থাকে। সুতরাং কিছুদিন পার হতে এলাকার উত্তেজিত পরিস্থিতি শান্ত হল। পাঁচজনের সালিসে ঠিক হল যে, উভয়ের যেন সত্বর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

শিউলি এবার বাড়িতে মুখ খুলল। সে যে রাজীবকে ভালবাসে, তা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিল এবং সে এ কথাও বলে দিল যে, সে বিয়ে করলে রাজীবকেই করবে। এর জন্য সে বাড়িতে নানা কথা শুনল। জাফরের হাতে প্রহারও খেল।

জাফর তাকে কত বকল, কত উপদেশ শুনাল। অথচ সে নিজেই ভালবাসার একটি শিকার। সে তাকে বলল, 'হারামজাদী! এই বয়সে ভালবাসা শিখেছিস্?

সিনেমার সংলাপ উদ্ধৃত ক'রে শিউলি তার জবাব দিল, 'কেন, ভালবাসা কি অন্যায়?'

---ভালবাসা অন্যায় নয়, কিন্তু তা প্রকাশের পদ্ধতি অন্যায়। যাকে তাকে

ভালবাসা অন্যায়।

এক আত্মীয় বৃদ্ধা বলল, ‘আজকালকার মেয়েদের এক মুরগী বয়স না হতেই পেরেম শিখে নেয়। আচ্ছা যামানা বটে বাবা! সব যেন ইঁচড়ে পাকা।’

অন্য এক বুড়ি বলল, ‘শিখবে না? সিনেমায় যে তা শিখানো হয়।’

---কেন বিয়ের পরে ভাতারের সাথে পেরেম হয় না?

---পেরেম ক’রে মনের মতো ভাতার চয়েস করা হয় যে।

---চয়েস ঠিক হলে কি বিয়েতে কারো অমত থাকে? ঢেটি মাগীরা ‘হ্যান্‌সাম’ দেখে চয়েস করে। আর অন্য কিছু দেখে না। উপযুক্ত মান-সম্মান, পজিশন, ঘর-বাড়ি, বংশ-বিভব কিচ্ছু দেখে না। আর এ জন্যেই বাড়ির লোকের অমত থাকে এবং সে নিজেও পস্তায় পরে। তার জন্যই পেরেমের বিয়ে টিকে না বেশি দিন।

---বুড়ি! তুমি পিরীতের কী বুঝবে? পিরীত না মানে ছোট জাত, ঘুম না মানে শ্মশান ঘাট, পিয়াস না মানে ধুবি ঘাট। পিরীতে মজিল মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। পিরীতের পেত্নী ভালো। জানো?

---এ্যাঁ! তেমনি কত কষ্ট, কত ঝামেলা, কত কীত্তি?

---পিরীতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

---অনেক নৌকা ডুবে জলে।

এই শ্রেণীর কত কথা শুনতে হচ্ছে বাড়িতে বসে শিউলিকে। তার মনে অবশ্য কোন প্রভাব পড়ে না। বুড়িদের বিরবিরিনিতে তার নেশা ছুটবে কেন? সে তো কোন মদখোর, বিড়িখোর, অযোগ্য, কুৎসিতকে পছন্দ করেনি। সে তো সঠিক ‘চয়েস’ করেছে। তা না হলে তার ভাই তার সাথে বন্ধুত্ব করবে কেন? ভাল বলে যাকে সে বন্ধু বানাতে পারে, ভাল বলে শিউলি তাকে স্বামী বানাতে পারে না কেন?

নিশ্চয় তার পদ্ধতি ভুল। কিন্তু এ পর্যন্ত মারাত্মক ভুল সে করেনি। এখন তো সে সামাজিক নিয়মে তাকে স্বামী বলে বরণ করতে চায়, তাহলে আবার আপত্তি কীসের?

আর কেউ পাশে না থাক ভিতরে ভিতরে মা পাশে আছে, সাঁটে আছে, সাথে আছে। আর মায়ের স্নেহের উপরেই ভরসা রেখে সে প্রতিবাদ-মুখর হয়ে বাপ-ভাইয়ের কথার জবাব দেয়।

এদিকে রাজীবের বিয়ে ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু তারও এক কথা, ‘বিয়ে যদি

করতে হয়, তাহলে কেবল শিউলিকেই করবে। নচেৎ না।’

কিন্তু মায়ের জেদ, ‘তুই বিয়ে না করলে আমার মরা মুখ দেখবি।’

অবশেষে মা-বাপ মিলে তার ফুফাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক হল। একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আব্বার সাথে পাত্রী দেখতে গেল। সঙ্গে নিল প্রাণপ্রিয় বন্ধু নাজিবকে। এক সময় আড়ালে সে তাকে বলল, ‘আমার আব্বা-আম্মাকে যদি বুঝাতে না পারিস, তাহলে পরিণতি খারাপ হবে বলে দিচ্ছি। তুই তোর বন্ধুকে হারিয়ে বসবি।’

নাজিব বলল, ‘বর্তমান পরিস্থিতির সামাল দিতে চল আগে পাত্রী দেখে আসি। দেখলেই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না।’

সুতরাং পাত্রী দেখা হয়ে গেল, বিয়ের প্রস্তুতিও চলতে লাগল। সে কোন মতেই বাড়ির লোককে বুঝাতে পারল না, শিউলিকে সে কতটা ভালবাসে। তারা কেউ জানে না যে, তার বক্ষের মহাশূন্যতা শিউলি ছাড়া অন্য কোন বিশ্বসুন্দরীও পূরণ করতে পারবে না। যারা দেহ (রূপ-সৌন্দর্য) পছন্দ করে, তাদের যে কোন একটা দেহ হলেই চলে। কিন্তু যারা মন পছন্দ করে, তাদের সেই মন না হলে চলে না, যা তারা পছন্দ করে।

আব্বা-আম্মার সাথে সাথ দিয়েছে তাঁদের বড়লোক আত্মীয়রা। যারা কোনদিন অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে চায়নি, তারা আজ দরদ দেখিয়ে রাজীবের বিয়ে দিতে একমত হয়েছে। তারা তার দারিদ্র্য দেখে দয়া করেনি, কিন্তু আজ তার নৈতিক অবক্ষয়ের সময় কটাক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু সে পাহাড়ের মতো অটল। নির্বিকার ও নির্ভীক-চিত্ত। যেন তার ‘কুছ পরোয়া নেই।’ অবশেষে যখন সে বিবাহের প্রস্তুতি দেখতে লাগল, তখন প্রমাদ গণল। ভাবল, এবার তার বিদায়ের পালা। মনে মনে বলতে লাগল,

‘পেরেছি যতেক কুড়ায়ে লয়েছি দুই হাতে ভালোবাসা,
বাধ্য আজিকে করিতে সাঙ্গ জীবনের কাঁদা-হাসা।’

এবার সে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু সে তো মহাপাপ। গভীর রাতে নিঃঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশে সে লিখতে লাগল,

জীবনের খেলা ফুরিয়ে এসেছে, আজ আমি চলে যাই,
দূর হতে যেন কে ডাকে আমায় হাতছানি-ইশারায়।
চলিবার পথে চলিয়াছি আমি ফিরিবার পথ নাহি,
অজানা জগৎ বন্ধুর পথ মন ডাকে ‘ত্রাহি ত্রাহি।’

চেনা পৃথিবীরে ফেলে যেতে মোর মনে লাগে বড় ব্যথা,
সেখানে কি আছে পৃথিবীর মতো নদী-বন-তরুলতা?
আছে কি চাঁদের জ্যোৎস্না সেথা, আছে কি পাখির গান,
আছে কি সেথায় প্রেমিকার প্রীতি, অভিসার-অভিমান?
যাবার বেলায় বারে বারে আমি ঘুরিয়া-ফিরিয়া চাই,
প্রেমময় এই সাধের পৃথিবী কেমনে ফেলিয়া যাই?

সুদীর্ঘ রাত্রির অবসান ঘটল। সকালে কিছু একটা ফায়সালা নেওয়ার আগে তার বড় মামা নিজ কর্মক্ষেত্র উড়িষ্যা থেকে বাড়ি ফিরল। সমস্ত ঘটনা শুনে সেও রাজীবকে বুঝাবার চেষ্টা করল। একদিন সে দোকানে বসে আছে, এমন সময় মামা এসে বলল, 'মামা! মনমরা হয়ে বসে কেন? এভাবে তো তোকে দেখি না? শোন, যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। এখন অতীত ভুলে গিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাব। নতুন ক'রে জীবন শুরু কর।

রাজীব বলল, 'মামা! ওরা জোর ক'রে খুশী-র সাথে আমার বিয়ে ঠিক করছে। কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই না।'

---তাহলে তুই শিউলিকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবি না? কিন্তু তুই হয়তো জানিস না, ওর প্রাইমারি স্কুলের এক মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ওর বিয়ে হয়ে যাবে। ও তোকে ভুলে যাবে। আর তুই ওকে ভুলতে পারবি না? তুই তো বেটা ছেলে, তোর পক্ষে এইভাবে ভেঙ্গে পড়া মানায় না।

---আপনার দোষ নেই মামা! আপনি তো এখানে থাকেন না। আপনাকে যা বুঝানো হয়েছে, তাই বুঝেছেন। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, সেও আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। একটা অবলা মেয়ে হয়ে যদি আমাকে পাওয়ার জন্য এত কষ্ট বরণ করতে পারে, তাহলে আমার ছেলে হয়ে কী করা উচিত, আপনিই বলুন?

---তুই কী চাস্ বল?

---আপাতত বিয়ে করব না।

---ঠিক আছে, আমি দেখছি কী করা যায়। কিন্তু তুই এমন কাজ করিস্ না, যাতে আমরা কষ্ট পাই।

বড় মামা বাড়ি গেল। রাজীবের রুমে প্রবেশ ক'রে টেবিলে তার ডায়েরি নজরে পড়ল। ডায়েরি খুলে 'বিদায়' কবিতা পড়ে সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'তোমরা কি কেউ ওর মনের কথা ভেবে দেখেছ? নাকি নিজেদের শুধু মান-

সম্মান নিয়ে ব্যস্ত? ছোট থেকে সে কোনদিন কিছু চায়নি এবং পায়ও নি। জীবন পথে নিজে একা সংগ্রাম ক'রে চলেছে। আজ হয়তো ও আবেগবশে একটা ভুল ক'রে ফেলেছে, তা বলে তার পুরো জীবনটাকে ভুল বলা যাবে না। আজ ওর পাশে নৈতিকভাবে আমাদের দাঁড়ানো কর্তব্য।'

বড় মামার কথা কাজে লেগে গেল। সুতরাং রাজীবের বিবাহ স্থগিত করা হল।

(২৩)

শিউলির বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। মাস্টার তাকে দেখেও গেছে। কিন্তু সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'যদি আমার বিয়ে দাও, তাহলে বিয়ের দিনেই আমি বিষ খাব। তখন দেখব, তোমাদের মান-সম্মান কোথায় থাকে?'

সুতরাং ঝুলন্ত অবস্থায় তাদের জীবন চলতে লাগল। আর একমাস পরে পূজোর বাজার। আগামী কাল সন্ধ্যায় রাত্রের গাড়িতে ছোট মামা-সহ রাজীব কলকাতায় মাল কিনতে যাবে। সকাল বেলায় ফেরি-ওয়ালা বস্ত্র-ব্যবসায়ী এক মহিলার মাধ্যমে শিউলির চিঠি এল। মহিলাটি রাজীবের দোকান থেকেই মাল নিত। বর্তমানে সেই একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

শিউলি লিখেছে, 'আজ দুপুরে আমি স্কুল থেকে তোমার বন্ধু কালামদের বাড়ি যাব। তুমি অবশ্যই আসবে।'

রাজীব পৌঁছে গেল বন্ধু কালামের বাড়ি। তার বাড়ি শিউলিদের গ্রামেই। বাড়িতে কেবল বন্ধু ও তার স্ত্রীর বসবাস। তার জন্যই আলাপের নিরাপদ স্থান সেইটি। ভাবীর হাতে তৈরি চা খেতে খেতে শিউলি এসে উপস্থিত হল। ভাবীর পাশে বসতেই সে কেঁদে কেঁদে রাজীবকে বলতে লাগল, 'আমি আর বাঁচতে পারব না। তুমি আমাকে বিয়ে কর।'

রাজীব সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'সে তো অবশ্যই করব। আমাকে একটু সময় দাও। আমি বাড়িটা ক'রে নিই।'

---রাজীব! তুমি বুঝতে পারছ না। আমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে। ছেলেটা মাস্টার ও বড়লোক। আর সেই কারণে জাফর ও ফোফার খুব পছন্দ।

---তাহলে ভাল তো! মাস্টার জামাই হবে, সুখে থাকবে।

---তুমিও তাই বলছ? খুব মজা লাগছে না? আমার পরিস্থিতি তুমি

আন্দাজ করতে পারছ না।

---ভেবেই বলছি। আমি গরীব। আমাকে বিয়ে ক'রে দুঃখ ছাড়া আর কী পাবে বল? আর তোমার বাড়ির লোকে তোমাকে সুখী দেখতে চায়।

---তুমি আমাকে ভুলতে পারবে রাজীব?

---আমার কথা ছাড়। তুমি নিজের কথা ভাব।

---আমি ভেবে নিয়েছি। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না কর, তাহলে আমি বিষ খাব। বিষ কিনেও রেখেছি!

---এমন কথা বলতে হয় না। মরে গেলে তো হেরেই গেলে। জিত হল কই? তাছাড়া এ জীবন মানুষের দেওয়া নয়, একে নষ্ট করার অধিকারও কারো নেই।

ভাবীও তাকে বুঝাতে লাগল, 'এত অধৈর্য হলে হয় না শিউলি! ক্ষান্ত হও, শান্ত হও।'

---আমি খুব ধৈর্য ধরেছি, খুব সহ্য করেছি। আর নয়। তুমি এখনই আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল। আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে চাই না!

---তা কী ক'রে হয়? আজ সন্ধ্যায় আমি কলকাতা যাব। তাছাড়া আমি তোমাকে চোরের মতো নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চাই না। আমি চাই তোমার বাড়ির লোককে মত করিয়ে অনুষ্ঠান ক'রে বিয়ে করতে। তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ।

---আমি মা-কে বলে-কয়ে এসেছি। আমি টাকা ও স্বর্ণ সাথে নিয়ে রেখেছি। মা সব জানে।

---তা হয় না শিউলি! সোনা আমার! ধৈর্য ধর। মাধ্যমিক পরীক্ষাটা দাও।

ভাবী বলল, 'দেখ শিউলি! প্রেম-পাগল মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে তখনই চলে যায়, যখন তার বিয়ের দিন হয়ে যায় অথবা তার পেটে বাচ্চা এসে যায়। তোমার তার কিছু হয়েছে কি?

---ছিঃ ভাবী! তার কিছু নয়। কিন্তু বাড়িতে থাকতে আমার কষ্ট হয়।

কালাম, তার স্ত্রী ও রাজীবের অনেক বুঝানোর পর শিউলি চোখের পানি মুছে তার চাচার বাড়ি ফিরে গেল। চাচা ছিল শিউলি-রাজীবের পক্ষে।

রাজীব দোকানে ফিরে গেল। তার মুখে বেদনার ছাপ, চোখের কোণে লুকানো বিরহের অশ্রু। মামা কলকাতা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চোখে তা সহজে ধরা পড়ল। কিছু বলল না।

কষ্ট এমন জিনিস, সেটা চেষ্টা ক'রে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা গেলেও, চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় না। তবুও রাজীব তার কাছে স্বাভাবিক হতে চাইল। ফর্দ ও টাকা-পয়সা নিয়ে বাস-স্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাইকেল নিয়ে জাফর এসে হাজির হল। ব্যগ্র-ব্যস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'রাজীব! শিউলি কোথায়?'

---তার কথা আমি কীভাবে জানব?

---না, মানে সে স্কুল থেকে আর বাড়ি ফিরেনি। হয়তো বা তোর কাছে এসে থাকতে পারে। জানা থাকলে দয়া ক'রে বল।

---চিন্তার কারণ নেই। সে তোর চাচার বাড়িতে আছে।

জাফর স্বস্তির শ্বাস নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। চাচার বাড়ি থেকে বোনকে নিয়ে বাড়িতে আবারও বুঝাল। মাস্টারের নানা গুণাবলী বর্ণনা ক'রে আবারও চেষ্টা করল বিয়েতে সম্মত করতে। কিন্তু বৃথা হল সে চেষ্টা। আবারও প্রহার খেতে হল ভাইয়ের হাতে। গঞ্জনা শুনতে হল ভাবীর কাছে। মায়ের হস্তক্ষেপে সে যাত্রাও শিউলি রক্ষা পেল।

পরে মাস্টারের কাছে খবর জানাজানি হলে সেও টেলিফোন-যোগে প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নিল। আর এক রাতের ভিতরেই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল জাফরের মনে। যেহেতু সে নিশ্চিত হল যে, শিউলির সে প্রেম কোন স্বাভাবিক প্রেম নয়। কারণ সে তার প্রেমের জন্য জান দিতেও প্রস্তুত।

প্রায় চব্বিশ ঘন্টার পর রাজীব ফিরে এল দোকানে। সে চব্বিশ ঘন্টা তাকে যেন চব্বিশ বছর মনে হয়েছিল। দুঃখীর কাছে দুঃখের সময় সুদীর্ঘই মনে হয়।

সকালে জাফর এসে সহাস্য মুখে সাক্ষাৎ ক'রে সে রাজীবকে বলল, 'চিন্তা করিস্ না রাজীব! সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরাই হেরে গেলাম রে। জিত তোদেরই হবে।'

রাজীব শুনে আজিব মনে এ খুশীর সংবাদ অনুধাবন ক'রে আনন্দে আত্মহারা হল। এবার বুঝি তাদের প্রেমের ফসল কাটার সময় আসন্ন হল। আর এ কথাও বুঝল যে, এ সম্মতি কেবল শিউলির হুমকিতেই হয়েছে।

এ খবর সে শিউলিকে জানাল। উভয়েই এ খবর শুনে প্রকৃতিস্থ হল। এবার বুঝি বিরহ-বেদনাহত দু'টি প্রাণের চির-মিলন ঘটবে। চির-দুঃখ ও বেদনাভরা নাটকের চির-অবসান ঘটবে।

কয়েক দিন পর বাজারের সিনেমা-হলে নতুন বই নেমেছে। প্রেম-কাহিনী জুড়ে এ বই নাকি খুব হিট করেছে। গ্রাম্য যুবক-যুবতীদের মনে তাই প্রেম-উৎসাহে খুশির ঢল নেমেছে। সেদিন কালাম ও রাজীব মিলে সিনেমা দেখতে গেছে। কালাম খেয়াল করেছে, পিছনের সিটে পরিচিত লোক। সে রাজীবকে বলল, 'ঐ দেখ, পিছনে তোর শালা ও শালাজ বসে সিনেমা দেখছে!'

রাজীব জাফরের বউকে দেখেনি। ঝামেলার মধ্যে তার বিয়ে হয়েছে, সে বিয়েতে সে নিমন্ত্রিতও ছিল না। সুতরাং সে তাকে ইশারাও করল না। কিন্তু বিরতির সময় জাফর নিজে বাদাম কিনে রাজীবের হাতে ধরিয়ে দিল। অতঃপর বই শেষ হলে বাইরে এসে তার স্ত্রীর সাথে রাজীবের পরিচয় করিয়ে দিল। রাজীব মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে সকলকে মিষ্টি খাওয়াল। তারপর সকলে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল। যাবার সময় ভাবী বলে গেল, 'শিউলি তোমার জন্য দিন গুনছে। একটু তাড়াতাড়ি কর।'

রাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজীব আর ঘুমাতে পারল না। সারা রাতই কেবল শিউলি ও তাকে নিয়ে সংসার করার কথা ভেবে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করল। মিলনের দিন নিকটবর্তী হলে অধৈর্য হওয়ারই তো কথা।

(২৪)

মানুষের মন বড় আজিব। মানুষের মন ফাঁকা মাঠে পড়ে থাকা এক খণ্ড তুলোর মতো অথবা শূন্য আকাশে ভাসমান এক খণ্ড মেঘের মতো। যখন তাতে বাতাস লাগে, তখনই তার বিপরীত দিকে অনায়াসে সরে যেতে থাকে।

সবাই জানছে, এবার শিউলি-রাজীবের বিয়ে হবে। কেবল দিন হওয়াটা বাকী আছে। এরই মধ্যে জাফর ও তার স্ত্রীর মন পাল্টে গেছে। শ্বশুর-বাড়ির লোকে জাফরকে ফুসমন্ত্র দিয়েছে, ঘরের কাছে বোনের বিয়ে দিলে সংসারের অনেক কিছুতে অধিকারের বেশী ভাগী হবে বোন-জামাই। তাছাড়া রাজীব এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে তার নেই। তোমাকেই তার বোঝা বহন করতে হবে। আর তখন তোমরা সমস্যায় পড়বে। তোমাদের ভাগ মারা যাবে। জমি, জায়গা, পুকুর, ভিটে সবকিছুতে ভাগ বসাবে। বড়লোক দেখে দূরে বিয়ে দিলে তত দাবী-দাওয়া ও দখলের ভয় থাকবে না। চেষ্টা ক'রে ঐ মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দাও অথবা অন্য কোথাও দূরে বিয়ে দাও।

এ মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে জাফর আবার তার রায় বদলে নিল। আবারও স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শিউলিকে বুঝাতে লাগল।

সামনে এল বর্ষাকাল। একটানা বৃষ্টির ফলে এলাকা প্লাবিত হল। রাজীবদের গ্রাম ও বাজার ছাড়া সমস্ত এলাকা পানির তলায় তলিয়ে গেল। সেই দুর্যোগে রাজীবের দোকানে ভাল বেচা-কেনা হল।

দুর্যোগ কেটে গেলে নিজের দুর্যোগ এসে উপস্থিত হল রাজীবের মনের আকাশে। শিউলি লুকিয়ে ফোন করেছে, 'আবার মত পাল্টিয়ে বিয়ের জন্য আমার সাথে জোর-জবরদস্তি করছে। ওরা আর মানবে না। ঈদের পরে বিয়ের দিন হয়ে যাবে। রাজীব! তুমি কিছু একটা কর।'

হাতে মাত্র দুই মাস সময়। আবার সেই টেনশন শুরু হল। কালামের মাধ্যমে আসল খবর নিতে চেষ্টা করল রাজীব। নাজিব গেছে দিল্লিতে কাজ করতে। আন্তরিক বন্ধু বলতে এখন কালাম একা।

পরের দিন বিকালে কালাম প্রতিবেদন নিয়ে এল। ব্যাপারটা সত্য। শিউলিকে তার অজান্তে ফুফুর বাড়িতে পাত্র নিজে দেখে গেছে। তার পছন্দও হয়েছে। সম্ভবতঃ ঈদের পরে বিয়ে হয়ে যাবে।

রাজীব আবার অস্থির হয়ে পড়ল। দোকান বন্ধ ক'রে রাতে এক জায়গায় বন্ধুদের সাথে বসে বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখতে লাগল। বন্ধু রাজু কলকাতায় থাকে। সে বলল, 'এ পরিস্থিতিতে তোদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'

সকলেই এতে সায় দিল। কিন্তু ফারাযী পাড়ার বন্ধু নাঈম বলল, 'কিন্তু এত দিনকার প্রেমে রাজীব পবিত্র ছিল। তাহলে এবার তার প্রেম অপবিত্র হয়ে যাবে। আর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার বিয়ে হলে সে বিবাহ বৈধ বিবাহ নয়। বিয়ের পরেও ব্যভিচার করা হয়।'

একজন উন্নাসিকতার সাথে বলল, 'ধুৎ! বৈধ হয় না কে বলল? কত লোক ঐভাবে বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করছে। সরকারীভাবে তার মান্যতাও আছে।'

---সে তো আছে। হানাফী ফিকাহ মতে হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মতে হবে না।

আর একজন হেসে বলল, 'পানি থেকে একজনকে হাত ধরে তুলে উদ্ধার করার সময় তার হাতে সোনার আংটি হালাল না হারাম---তা নিয়ে

ফতোয়াবাজি করিস্ না। আগে তাকে উদ্ধার কর, তারপর ফতোয়াবাজি করিস।'

ফারাযী বন্ধু চুপ হয়ে গেল। আর একজন বলল, 'নামায-রোযা করার সময় খোঁজ নেই। বিয়ের সময় হালাল না হারাম!'

রাজীব বলল, 'না, চির জীবনের ব্যাপার তো। ভেবে-চিন্তে ফায়সালা করাই ভাল। তাছাড়া আমার আব্বা-আম্মা ভাল নামাযী। আব্বা তবলীগেও যান। এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, যাতে আমি তাদের কাছে ছোট হয়ে যাই।'

---তাহলে তুই শিউলির কথা ভুলে যা। ও-ঃ! খাবে মদ, তা আবার ডান হাতে, না বাম হাতে? যত ঢঙ!

অন্য একজন বলল, 'ঠিক বলেছিস্। শিউলিকে পেতে হলে এ ছাড়া কোন পথ নেই। এ একটাই পথ তোর খোলা আছে। তুই ওকে নিয়ে রাজুর সাথে কলকাতায় চলে যা। ও তোদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেবে।'

রাজীব বলল, 'না-রে! তা হয় না। দেখলি না, না পালিয়ে গিয়েও দুই পরিবারের লোকের কত অপমান ও লাঞ্ছনা হল? আবার বড় ভয় হয়।'

---কিসের লজ্জা কিসের ভয়, প্রেম-পিরীতে সবই সয়। আরে ভালোবাসা ও যুদ্ধে কোন সম্মান নেই!

---অন্য উপায় বল।

---আমার কাছে একটা সহজ উপায় আছে?

---কী সেটা?

---বিষ কিনে দে, আমি শিউলিকে দিয়ে আসি।

---তুই কি পাগল নাকি?

---পাগলই তো। ভালবাসা করার আগে এ সব মান-সম্মান ও ফতোয়ার কথা ভাবতে হতো। এখন এই উভয়-সংকট পরিস্থিতিতে মান-ধর্ম দেখলে চলবে না। একটা মেয়ের জীবন তুই নষ্ট করতে পারিস না।

ফোনে দোলাভাইয়ের মত নিল রাজীব। সেও বন্ধুদের সাথে একমত। চিন্তা হল দোকানটা নিয়ে। সেটা তো বন্ধ হয়ে যাবে। আর দোকান বন্ধ হয়ে গেলে তারা খাবে কী? এক বন্ধু বলল, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তোর ছোট মামা চালাবে। দরকার হলে আমরা তার সহযোগিতা করব। তাছাড়া তুই তো একেবারে চলে যাচ্ছিস না। এক মাস পরেই ফিরে আসবি। আর

তখন দেখবি, সবাই মেনে নিচ্ছে।'

---কিন্তু বউ নিয়ে বাইরে থাকলে টাকার দরকার আছে। পরিমাণ মতো টাকার ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে। দোকান থেকে নিলে মামার অবিশ্বাস আসতে পারে।

---টাকার ব্যবস্থাও আমরা ক'রে দেব। তাছাড়া শিউলির সাথেও টাকা ও অলংকার অবশ্যই থাকবে। তার মা তো পুরো সাপোর্টে আছে।

অবৈধ প্রেম একাকী সফল হয় না। সঙ্গে সাইড-হিরো না থাকলে হিরোর জীবন কৃতকার্য হয় না। রাজীবেরও তাই হল। পূজোর দশমীর দিন 'পলায়নের দিন' ঠিক করা হল। সেদিন বাজার উৎসবে ব্যস্ত থাকবে। আর তারা সেই সুযোগে গা-ঢাকা দেবে।

দশমীর দিন সকালে রাজীব বাড়িতে বলল, 'আমি আজ বর্ধমান যাচ্ছি, খালার বাড়ি বেড়াতে।'

সকলকে দেখা ক'রে বাস-স্ট্যাণ্ডে চলে গেল। সেখানে তার সফরের ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার এক বন্ধু। তারা দু'জনে বাস ধরে শহরে এসে পৌঁছল।

ওদিকে ধনীর 'ধন্যি-মেয়ে' শিউলি পুকুরে গোসল করতে যাওয়ার নাম ক'রে মায়ের কাছে দুআ ও বিদায় নিয়ে দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

তার জন্য গ্রামের এক প্রান্তে ট্রলি অপেক্ষা করছিল। ট্রলি পাশের এক গ্রামে পৌঁছে দিল। সেখানে মারুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল রাজীবের দোলাভাই। তাকে তুলে নিয়ে সোজা শহরে গিয়ে রাজীবকে তুলে নিল। বন্ধুদেরকে বিদায় জানিয়ে দোলাভাইয়ের সাথে তারা গিয়ে পৌঁছল তার বন্ধুর শ্বশুর-গ্রামে। সেখানে দু'জনকে নামিয়ে সকল ব্যবস্থা সহজ ক'রে মারুতি নিয়ে ফিরে গেল দোলাভাই।

দু'জনে আজ চিরদিনের জন্য মিলিত হতে পেরে নানা শঙ্কার মাঝে আনন্দিত ছিল। শিউলি যেন এই পলায়নের মাঝে এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করছিল। এখন সে এমন পুরুষের দায়িত্বে এল, যে তাকে ভালবাসে ও চিরদিন বাসবে। না জানে অন্যের সাথে বিয়ে হয়ে গেলে সে হয়তো আজীবন ভালবাসার ভিখারিনী থেকে যেত। যেহেতু তার মতো অনেক প্রেম-পাগলরা ধারণা করে যে, দেশের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ দম্পতি, যারা প্রেম না ক'রেই বিয়ে করেছে, তাদের জীবনে কোন ভালবাসাই নেই।

(২৫)

রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। এখনও শিউলি বাড়ি ফিরেনি। চারিদিকে তার খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। সন্দেহের ভিত্তিতে রাজীবের বাড়ি গিয়ে জাফর জানতে পারল, সে আজ সকালে 'বর্ধমান যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে গেছে। এ খবরে বাড়ির লোকে নিশ্চিত হল যে, তারা পালিয়েছে।

রাত্রিতেও বসে থাকল না জাফরের লোকজন। রাজীবের সকল আত্মীয় ও বন্ধুর নিকটস্থ বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খোঁজা হল। কোন হদিস মিলল না। কেউ তাদের কথা বলতে পারল না।

সকাল হতে না হতেই গ্রামের পুরুষ-মহিলা, ছেলে-মেয়ে সব এসে হাজির হল পটলদের দোকানের সামনে শিউলিদের বাড়ির কাছে। যার যা খুশি, তাই বলতে লাগল।

---ঘরের শাসন না থাকলে বেরিয়ে যাবে না?

---তোমার মেয়ে বেরিয়ে যাবে না, তার কোন গ্যারেন্টি আছে?

---ঠিক সময়ে বিয়ে না দিলে বেরিয়ে যাবে না?

---কত বিবাহিত মেয়েও বেরিয়ে যাচ্ছে।

---খারাপ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে ভাল মেয়েও খারাপ হয়ে যায়।

---স্কুল-কলেজে বড় পর্যন্ত পড়ালে তো বেরিয়ে যাবেই।

---আরে কত মাদ্রাসা-ওয়ালীরাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

---বয়সকালে পর্দা না করলে তো বেরিয়ে যাবেই।

---কত বোরকা-ওয়ালী পর্দা-বিবিরাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

---সিনেমাতে সব মাটি ক'রে দিচ্ছে।

---সিনেমা না দেখেও অনেকে ছিনালি করছে।

---মেয়েটা সাধা-সিধে, ছেলেটাই বদমাশ।

---আরে! মেয়েই কোর্টে গিয়ে বলে, 'আমিই ওকে নিয়ে এসেছি।'

---ভাঁড় ভাল নয়, মোদ গড়াগড়ি!

---কুল-বংশের লোকেদের মুখে চুন-কালি দিয়ে গেল!

---প্রেমের জয় প্রমাণ করল বাপু! দুঃসাহস বটে!

---আরে পিয়ার কিয়া, তো ডরনা কিয়া?

---ঘরে আসা-যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে না। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়েছে।

---গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়েও দুধ দিয়ে আসে।

---কাউকে ঘরে বেঁধে বা চাবি লাগিয়ে রাখা হয় নাকি?

---সস্তা দামের কাপড় পেত না? দোকানদারের সাথে পিরীত ভাল জমে যে। দেখবি বছর না ঘুরতেই ছেলে হবে।

---আরে পালিয়েছে তো কী হয়েছে? বিয়ে ক'রে ঠিক ফিরে আসবে। পছন্দ ক'রে বিয়ে করা কী অন্যায় নাকি?

---তুমি যে পালিয়ে বিয়ে করেছ, তুমি তো বলবেই।

---বাড়িতে এত লোক থাকতে এত চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেল?

---আরে কেউ না জানলে মা অবশ্যই জানবে। সে মা-কে নিশ্চয় বলে গেছে, কোথায় গিয়ে থাকবে?

---মা কিন্তু অস্বীকার করে। সে বলে, সে কিছু জানে না। সে এ ব্যাপারে মেয়েকে শাসন করত। বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে বলত। তারই কান্না বেশি। জানি না, তা লোক-দেখানি কি না?

---আরে সব নাটক! তলায় তলায় সাঁটে আছে।

---একদিন না একদিন ফিরে আসতেই হবে। যখনই গ্রাম ঢুকবে, তখনই গ্রাম্য কমিটির তরফ থেকে মার লাগা, জরিমানা কর। তাহলে অন্য কেউ এমন কুকাজ করতে সাহস পাবে না।

এইভাবে 'কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে কে মানে কাহার বোল।' দুশমনদের দুশমন-হাসি এবং বন্ধুদের আক্ষেপ-বাক্য সমাবেশকে মুখরিত ক'রে রেখেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমি দুপুর বেলায় শিউলিকে একটা ছেলের সঙ্গে ট্রলিতে যেতে দেখেছি।'

---ছেলেটা কে?

---তাকে আমি চিনি না। তবে ট্রলি-ওয়ালাকে চিনি।

সাথে সাথে লোক পাঠিয়ে ট্রলি-ওয়ালাকে ডাকা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, 'তারা কোথায় গেছে, তা বলতে পারব না। তবে ছেলেটাকে আমি রাজীবের সঙ্গে অনেকবার দেখেছি। ওর গ্রামেই বাড়ি। কাপড়ের হকারি করে। পরিষ্কার রঙ, পাতলা গড়ন। নামটা বলতে পারব না। তবে কথার মধ্যে স্টাইল আছে।

হুলিয়া শুনেই জাফরের আর বুঝতে বাকী থাকল না, ছেলেটি কে। তাকে ধরার পরিকল্পনা চলতে লাগল। সে খবর কালাম তাকে পৌঁছে দিয়ে বলল,

'সাবধান! তোকে ওরা চিনতে পেরেছে। তুই ক'দিন বাজার দিয়ে যাস্ না। আর পারলে তুই ক'দিনকার মতো বেড়াতে চলে যা।'

কিন্তু সে হিরোর মতো জবাব দিয়ে বলল, 'চিনতে পেরেছে তো কী হয়েছে। কী করবে ক'রে নেক ওরা।'

বিকালে বুক ফুলিয়ে চলেও গেল বাজারে। নায়িকার পক্ষের লোকে তাকে ধরে জেরা করতে লাগল, 'বল, রাজীব কোথায়?'

---আমি জানি না।

---দেখ ভাই! তোর সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আর আমাদের মাথার এখন ঠিক নেই। তুই শুধু বলে দে, ওরা কোথায় গেছে?

সে অভ্যাসগতভাবে স্টাইল ক'রেই বলল, 'বললাম তো, আমি জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে কিল-ঘুসি শুরু হয়ে গেল। তখন সে বলল, 'বলছি বলছি, ওর দোলাভাই জানে, ওরা কোথায় আছে।'

তারপর সে রাজীবের দোকানে এল। কালাম তাকে বলল, 'তোকে বললাম, বাজার দিয়ে যাস্ না। কিন্তু তুই শুনলি না। স্টাইল দেখাতে গিয়ে দিলি সব গণ্ডগোল ক'রে। যা এখন বাড়ি গিয়ে ওষুধ খা।'

পরদিন সকালে নায়িকার পক্ষ নায়কের দোলাভাইয়ের গ্রাম গিয়ে তাকে ঠিকানা বলার জন্য চাপ দিল। বলতে না চাইলে ঝামেলা বাধার উপক্রম হল। বাধ্য হয়ে বলেই দিল নায়ক-নায়িকার ঠিকানা।

ওদিকে তারা যে বাড়িতে ছিল, সে বাড়ির লোকে বিয়ের বন্দোবস্ত করতে দেরি ক'রে দেয়। দুই রাত এক দিন গত হয়ে গেল। ঠিক করা হয়েছিল আজ তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেবে এবং রাতের ট্রেনে দিল্লি রওয়ানা হয়ে যাবে। সকালে তারা চা খেতে বসেছে, এমন সময় দোলাভাইয়ের বন্ধু এসে বলছে, 'তোমাদের বাড়িতে নাকি প্রচণ্ড অশান্তি চলছে। তোমার এক বন্ধু মার খেয়েছে। অবশেষে তারা তোমাদের ঠিকানা জানতে পেরে, দু'টি লোক মারুতি ক'রে তোমাদেরকে নিতে এসেছে। তোমরা যদি অনুমতি দাও, তাহলে আমরা ওদেরকে বাড়ি ঢুকতে দেব। না হলে ওদের বাপের ক্ষমতা নেই তোমাদেরকে নিয়ে যাবার।'

শিউলি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, তার ফোফা ও গ্রাম সম্পর্কের এক ভাই এসেছে। ঐ ভাই আবার রাজীবের কর্নেল খালুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে রাজীবকে খুব ভালভাবেই চেনে।

দু'জনে ভেবে ওদেরকে বাড়িতে আসার অনুমতি দিল। প্রবেশ করতেই শিউলি সামনে এলে তার ফোফা তার গালে টেনে একটি চড় মেরে বলতে লাগল, 'তোর ভাই একটা ভাল ঘরের মেয়েকে বিয়ে করল। আর তুই একটা ছোটলোক ঘরের ছেলের সঙ্গে প্রেম ক'রে পালিয়ে এলি? ছিঃ ছিঃ! বংশের মান-মর্যাদা সব ডুবিয়ে দিলি!'

শিউলির ঐ ভাই বলে উঠল, 'চুপ করুন, ঠাণ্ডা হন। আপনি এ ছেলেটার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এও আসলে খুব বড় ঘরের ছেলে। ওর বংশ আপনাদের থেকে অনেক বড়। এর সাথে শিউলির বিয়ে হলে আপনাদের মাথা উঁচু হবে, নিচু হবে না।'

পরে আক্ষেপ-কণ্ঠে ফোফা বলল, 'আসলে আমি খুব রেগে ছিলাম।'

ভাইটা বলল, 'রাজীব তুমি এমন কাজ করলে? তুমি আমাকে একবার জানাতে পারতে। আমি বিয়ের ব্যবস্থা করতাম।'

রাজীব মনে মনেই বলল, 'এ ব্যাপারে আপনারা সবই জানতেন। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি তাই।'

শিউলির ভাইটা আবার বলল, 'যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তুমি বাড়ি চলে যাও এবং বাড়িতে গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল। আমি এদিকে সব দেখছি। আর আমাদের সঙ্গে শিউলিকে নিয়ে যাচ্ছি। ও ওর ফুফুর বাড়িতে থাকবে। তোমাদের কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

দু'জনে মিথ্যা ক'রে বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

বিয়ে হয়ে গেছে শুনে ফোফার রাগের মিটার যেন আবার বেড়ে উঠল। সে গর্জন দিয়ে বলল, 'বিয়ের কাগজ দেখাও। আর বিয়ে হয়ে গেলেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

রাজীব বলল, 'আমরা দু'জনে নির্জনে পাশের ঘরে একটু কথা বলতে চাই।'

ভাইটা অনুমতি দিয়ে বলল, 'যাও রাজীব যাও! তোমরা কথা বল।'

পাশের রুমে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লেগে রাজীব শিউলিকে বলল, 'কী করবে?'

---তুমি যা বলবে, তাই করব?

ক্ষণকাল ভেবে বলল, 'তুমি এদের সঙ্গে চলে যাও। তারপরেও যদি আমাদের সঙ্গে চালাকি করতে চায়, তাহলে তুমি যেন কোন অঘটন ঘটাতে

চেষ্টা করো না। আমার উপর ভরসা রাখ। প্রয়োজন পড়লে বিয়ের দিনেও আমি তোমাকে আবার তুলে নিয়ে আসব।'

সুতরাং শিউলি আত্মীয়দের সঙ্গে ফুফুর বাড়ি এবং সেখানে ২/৩ দিন থাকার পরে নিজ বাড়ি চলে গেল। সেখানে জাফরের হাতে চাবুক ও কত শত নোংরা নোংরা গালি খেতে হল তাকে।

আর রাজীব লজ্জায় বাড়ি না গিয়ে খালার বাড়ি বর্ধমান চলে গেল।

(২৬)

একদিন বেড়ানোর পর রাজীব বর্ধমানের রাজবাড়ি দেখতে গিয়েছিল। সেই সময় তার খালাত বোন তার ব্যাগ খুলে কী দেখতে গিয়ে দেখতে পেল, তাতে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ সহ নানা কসমেটিক সামগ্রী রয়েছে। কী ব্যাপার? কৌতূহলবশতঃ সে তার মা-কে বলল। মা ব্যাগটি বন্ধ ক'রে রাজীবের মা-কে ফোন করল। বোন বোনের কাছ থেকে তার ছেলের সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে অবাক হল। তবে মনে কারো ঘৃণা এল না। কারণ পরিবেশে এমন কাণ্ড বর্তমানে বড় স্বাভাবিক।

সন্ধ্যায় রাজীব ফিরে এলে খালা বলতে লাগল, 'কিছু ভাবিস না বাবা! সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রাজীব অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কিসের ভাবনার কথা বলছ খালা?'

পাশ থেকে খালাত বোন মালা বলল, 'আমরা তোমার ব্যাগ খুলে ভাবীর সব জিনিস দেখে নিয়েছি।'

রাজীব লজ্জিত হল, সেই সাথে দুঃখিতও।

খালা বলল, 'তোর ছোট মামা তোকে ফোন করতে বলেছে। তুই চিন্তা করিস্ না। খারাপ মেয়েদের পাল্লায় পড়লে ভাল ছেলেও খারাপ হয়ে যায়।'

রাজীবের মনে কথাটা কাঁটা বিঁধার মতো বিঁধল। প্রতিবাদ ক'রে বলে উঠল, 'তুমি ভুল বুঝছ খালা! শিউলি মোটেই খারাপ মেয়ে নয়।'

মালা বলল, 'তাহলে তুমি খারাপ ছেলে।'

রাজীব বলল, 'আমি তাকে বিয়ে করেছি। বিয়ে করা কি খারাপ?'

মালা হেসে বলল, 'অবশ্যই, ইয়ে ক'রে বিয়ে করা, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা খারাপ নয়?'

খালা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, 'যাই হোক, তুই মামাকে একবার ফোন

কর।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন লাগাল, 'হ্যালো!'

---কে? রাজীব?

---হ্যাঁ, আমি বলছি।

---ভাল আছিস?

---হ্যাঁ।

---ওরা তোকে মারেনি তো?

---না, না। তাই পারে? দোলাভাইয়ের বন্ধু ছিল তো। ওরা বলেছিল, তুমি বাড়ি গিয়ে বিয়ের জন্য লোক পাঠাবে।

---তুই চিন্তা করিস্ না। আমরা আগামী কাল ওদের বাড়ি যাব।

আরো দু-চারদিন বেড়িয়ে রাজীব বাড়ি ফিরল। বর্তমানে সে এলাকার সকলের আলোচ্য বিষয়, দর্শনীয় ব্যক্তিত্ব, হিরো নাম্বার ওয়ান। এ সব খেয়াল হতেই সে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে লাগল। বাড়ি থেকে খুব কম বের হতে লাগল। একা একা থাকতে পছন্দ করল। মাতাল যেমন নেশার ঘোরে শরীরের ব্যথা-বেদনা কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু নেশা ছুটার পর তা বুঝতে পারে, আদর্শ প্রেমিক রাজীবেরও সেই দশা হল। প্রেমের নেশায় সকল মান-লজ্জা ও ভয়কে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমিকাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছিল। সেই নেশা ছুটার পর এখন তার অনুভূত হল নানা নীতি-নৈতিকতার কথা।

বহু প্রতীক্ষার পর সেই অবাঞ্ছনীয় বিবাহ স্থির হয়ে গেল। উভয় পক্ষের ইচ্ছা, তাদের বিয়ে কোন মোল্লাকে দু-একশ টাকা দিয়ে হয়ে থাকলেও এখন উভয় পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে শরয়ী বিবাহ-বন্ধন কায়েম করবে।

এক শুভ দিনে 'পান-চিনি' বা 'লগন' গেল। কন্যাপক্ষ রাজীবের আব্বাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের দাবী-দাওয়া কী?'

আব্বা বললেন, 'আমি পণ-যৌতুকের বিরোধী মানুষ। তবে আপনারা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

বিয়ে যেহেতু দিতে চাচ্ছিল না, সেহেতু দোলাভাই রাজীবকে শিখিয়ে দিল, 'দুই লক্ষ টাকা ও পাঁচ ভরি সোনা ছাড়া বিয়ে করবে না! এখন যা বলবে, তাই ওরা দিতে বাধ্য হবে। কারণ এখন ওদের মেয়ে কলঙ্কিনী। গ্রামে গ্রামে তার কলঙ্কের স্রোত বইছে। ওর আর কোথাও বিয়ে হবে না। আর আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা চাই, নচেৎ তোমার বিয়েতে আমি আসব না।'

কয়েকদিন পরে শিউলির সেই ভাই বাজারে রাজীবের সাথে দেখা ক'রে বলল, 'পূর্বে যা হয়েছে, ভুলে যাও বাবা! বিয়ে একবারই হয়। অনেকের অনেক রকম আশা থাকে তাতে। কেউ মোটর-বাইক নেয়, কেউ সাইকেল-ঘড়ি নেয়, কেউ টাকা নেয় ইত্যাদি। তোমার কিছু আশা থাকলে লজ্জা করো না। আমাকে খুলে বল।'

রাজীব বলল, 'আপনারা ধারণা করবেন না যে, আমি হয়তো তাদের ধন বা টাকা-পয়সার লোভে শিউলিকে ফাঁসিয়েছি। শিউলিকে পাওয়াই আমার বড় আশা। আপনারা আমাকে শিউলি দিন। তাহলেই আমার বাগানে সব ফুলের সৌন্দর্য আসবে।'

---ধন্যবাদ বাবা তোমাকে।

রাজীব আসলে অন্য দিকে ভাল ছেলে। এলাকায় তার নাম আছে। কোন পাপ-পঙ্কিলতায় সে থাকে না। তবে চরিত্র ঠিক রেখে ভালবাসাটাকে সে পাপ বলে জানত না। অবশ্য বিয়েতে পণ বা যৌতুক নেওয়াকে সে পাপ বলেই জানে। সে তার আব্বার কাছে একটি কাল্পনিক গল্প শুনেছে, এক ব্যক্তি একটা মহাপাপ করার ফলে অভিশপ্ত হয়ে তার চেহারা বিকৃত হয়। পাপের কথা অনুভব ক'রে সে এক পীর সাহেবের কাছে প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানতে যায়। পীর সাহেব বলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা বস্তু ভক্ষণ করলে তুমি তোমার আসল চেহারা ফিরে পাবে।'

তখন সে ভাবল, সবচেয়ে নোংরা বস্তু নিশ্চয় পায়খানা হবে। সুতরাং এক সময় সে তা খেতে গেলে আওয়াজ এল, 'আমি সবচেয়ে নোংরা বস্তু নই। এ পৃথিবীতে আমার চাইতে আরো বেশি নোংরা বস্তু আছে।'

তাহলে তা কী? এক সময় সে দেখল, একটা কুকুর মরে-পচে পড়ে আছে। আর তার দেহ থেকে পোকা বের হচ্ছে। সে ভাবল, নিশ্চয় এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা বস্তু হবে। সুতরাং সে তা খেতে গেলে আওয়াজ এল, 'আমি সবচেয়ে নোংরা বস্তু নই। এ পৃথিবীতে আমার চাইতে আরো বেশি নোংরা বস্তু আছে।'

সে ভাবতে লাগল, এর চাইতে আরো বেশি নোংরা বস্তু কী তাহলে?

সেদিন রাত্রে এক বিয়ের নিমন্ত্রণ খেল পোলাও-কোপ্তা। অতঃপর ঘুমিয়ে সকালে উঠে দেখল, তার আসল চেহারা ফিরে এসেছে। তাহলে নিশ্চয় পোলাও-কোপ্তা খেয়ে তার সে আসল চেহারা ফিরে পেয়েছে।

ছুটল পীর সাহেবের কাছে। বলল, 'আপনি একটা মস্ত ভণ্ড পীর!'

---কেন? তার প্রমাণ?

---আপনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা বস্তু ভক্ষণ করলে তুমি তোমার আসল চেহারা ফিরে পাবে।' আর আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ ক'রে আমার আসল চেহারা ফিরে পেয়েছি।

---কী খেয়ে তুমি তোমার আসল চেহারা ফিরে পেয়েছ?

---এক বিয়ে বাড়িতে পোলাও-কোপ্তা খেয়ে।

---তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, ঐ খানা তারা কোন্ টাকা ব্যয় ক'রে তৈরি করেছিল?

জিজ্ঞাসা ক'রে সে জানতে পারল, সেটা ছিল বরপণের টাকা।

সুতরাং রাজীবের ধারণায় পণ ছিল খুবই নোংরা জিনিস। সে কি তাই নিতে পারে? তাছাড়া পণ দিতে হবে না বলে সমাজের অনেক মানুষ নিজ মেয়েকে সুযোগ দেয় প্রেম করতে। যেহেতু যে সাধারণতঃ মেয়েলোভী হয়, সে পণলোভী হয় না। অবশ্য মেয়েকে পণবন্দী বানিয়ে পণের টাকা আদায় করার মতো নিষ্ঠুরতাও সমাজে আছে। রাজীব তাদের মধ্যে কেউ নয়। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সে কিচ্ছু চায় না। শিউলি পেলে তার সব চাওয়া পাওয়া হবে।

এ পর্যন্ত সব কিছু বরকনের আশানুরূপ। কেবল শিউলির ভাই ও ফোফা এখনো পর্যন্ত তাদের এ বিয়েতে সম্মত নয়।

সকল বন্ধুও এ বিয়েতে খুশী, অনেকে তার সাথে নানা উপহাস ও মস্করা করে। এক সময় কালাম বলল, 'আর যা বল, শ্বশুর-বাড়িতে তোর মজা নেই।'

---তা কেন?

---তোর কেলিকুঞ্চিকা নেই।

---কেলিকুঞ্চিকা নেই মানে?

---আরে কেলি মানে আমোদ-প্রমোদ, আর কুঞ্চিকা মানে চাবি। তার মানে তোর আমোদের চাবি নেই।

---আমোদের চাবি আবার কে?

---তোর সেটা নেই তো।

---তার মানে শালী?

---বুঝেছিস্ তাহলে? আরে লোকে বলে, 'বাগানে কখনো ফোটে না ফুল

যদি না থাকে মালী, বিয়ের আসরে বলো না কবুল যদি না থাকে শালী।'

---আমার শিউলিই সব, সেই আমার সব আমোদের আধার। আর জানিস তো, 'শালী, গালে লাগায় কালি?'

(২৭)

আজ শিউলি-রাজীবের শুভ-বিবাহ। দেশাচার হিসাবে বরযাত্রী সহ কনের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে রাজীব। বিবাহ-বন্ধনের সময় গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করল শিউলির ফোফা। কাযী সাহেব দেনমোহরের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'এক লক্ষ এক টাকা মোহর বাঁধুন।'

দোলাভাই আসেনি বিয়েতে। কারণ, তার শর্ত পালন করা হয়নি তাই। রাজীব কানে কানে তার মামাকে বলল, 'দশ হাজার এক টাকার বেশি মোহর বাঁধবেন না।'

কাযী সাহেব ও গ্রামের দু'জন মুরুব্বী বলতে লাগলেন, 'দশ হাজার এক টাকা আবার মোহর বাঁধা হয় নাকি?'

বরপক্ষের একজন বলল, 'কেন হবে না? দশ হাজার এক টাকা কি টাকা নয়?

---খুব কম হয়ে যাচ্ছে। বেশি ক'রে বাঁধুন।

---বেশি বাঁধলে আদায় হবে কীভাবে?

---কে আর আদায় দেয় ভাই? বাঁধা নিয়ম, তাই বাঁধতে হয়। বাসর রাতে স্ত্রীর কাছে মাফ চাইলেই মাফ হয়ে যায়।

---কিন্তু গোলমালের সময় আবার সেই 'মাফ' হঠাৎ 'বাপ' হয়ে ওঠে!

---আসলে ওই গোলমালের ভয়েই বেশি বাঁধার নিয়ম হয়ে গেছে সমাজে। তাছাড়া আদায় কেউ দেয় না।

ইতিমধ্যে কনের পিতা এসে উপস্থিত হল মজলিসে। সে বলল, 'কী ব্যাপার? মোহর নিয়ে ঝগড়া? রাজীব বাবাজী যা বলছে, তাই হবে। তাতে শুধু এক টাকা হলেও আমি রাজি।'

অবশেষে যোহরের নামাযের পরে মসজিদে বিয়ে পড়ানো হল। সমাজে

প্রচলিত সেই 'বিবির ইযন' নেওয়ার সাজানো নাটক অভিনীত হল। হাত তুলে জামাআতী দুআ হল। ওলিমার বাতাসা বিতরণ করা হল।

সেই মজলিসে সকলে জানতে পারল, রাজীব বিনা পণে বিয়ে করছে। ইমাম সাহেব ও মুরুব্বীরা বলতে লাগলেন, 'আমরা জীবনে অনেক বিয়ে পড়িয়েছি, কিন্তু বিনা পণের এত কম মোহরের বিয়ে আজ প্রথম পড়ালাম।'

বিবাহ-ভোজনের জন্য বেশ ভাল আয়োজন ছিল। খাসির মাংস, মাছ ইত্যাদি ইচ্ছামতো খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কিছু লোকের বর অপছন্দ ছিল বলে বরযাত্রীর খাদ্য-পরিবেশনে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করল।

অবশ্য এর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল বরপক্ষের তরফ থেকেও কনেযাত্রীর সাথে অনুরূপ ব্যবহার ক'রে।

যাই হোক, নানা টানা-পোড়েনের মাঝ দিয়ে শিউলি-রাজীবের নতুন জীবন শুরু হল। প্রেমে সাফল্য লাভ ক'রে তারা যে বর্ণনাতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করল, তাতে তারা যেন পৃথিবীতে জান্নাত অর্জন করল।

ব্যবসাতেও নতুনভাবে নতুন উদ্যোগে মনোযোগ দিল। ব্যবসাও ভাল চলতে লাগল। বড় হওয়ার স্বপ্নে তার আর একটি উদ্যোগ মাথায় ছিল। তা হল নিজস্ব একটা বাড়ি। তার প্রচেষ্টা চলতে লাগল।

পরিশেষে জাফরেরও ভুল ভাঙ্গল যে, রাজীব লোভী নয়। সে জমি-জায়গা বা অর্থের লোভে শিউলিকে ভালবেসে বিয়ে করেনি। সুতরাং সে রাজীবকে আগের মতো ভালবাসতে লাগল। ধীরে ধীরে তার সকল আত্মীয়-স্বজনদের মনেরও পরিবর্তন ঘটল।

শির্কী পরিবেশের শির্কী মনের আবেগ উথলে উঠলে রাজীব ও তার আব্বা-আম্মা উন্নতি দেখে ভাবতে লাগল, এ সব ওলী-আওলিয়াদের দুআ। মাযারভক্ত ঘরের ছেলে মাযারী না হয়ে যায় না। তাই রাজীব শুকরানার নযরানা দিতে সপরিবারে পাথর-চাপুড়ির দাতা-বাবার মেলা গেল। সেখান থেকে তবরুক স্বরূপ দাতা-বাবার দাড়ি ও যমযমের পানি নিয়ে এল, যাতে বড় হওয়ার স্বপ্নে তা অসীলা হয়।

শিউলি-রাজীব যতই সুখী হোক, তাদের মন থেকে প্রেমের নেশা কেটে গেলে পূর্বের ঘটনার জেরে নিজেদেরকে খুবই লজ্জিত বোধ করতে লাগল।

প্রেমের জিনিস যত দূরে থাকে, প্রেম তত বেড়ে চলে। মিলনের সময় যত কাছে হয়, ধৈর্যের বাঁধ তত বেশী ভাঙ্গতে চায়। আর মিলন ঘটে গেলে প্রেমের

দশ ভাগের নয় ভাগ নেশা এমনিতেই কেটে যায়।

ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে কেড়ে নেয় বেশী। ভালবেসে বিয়ে করা যায়, কিন্তু তার জেরে চরিত্রে লাগা কলঙ্কের কালিমা মুছে ফেলা যায় না।

শিউলিকে আজও অনেকে ঘৃণা করে। কারো সাথে ঝগড়া বাধলে সে তাকে 'বেরিন-জুউনি' বলে খোঁটা দেয়। অনেক আত্মীয় তাদেরকে পছন্দ করে না। তার খালু তাদের বাড়ি আসে না। তার আব্বার সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে তাকে নিয়েই। খালু বলেছিল, 'ও মেয়েকে আর ঘর ঢুকতে দিয়ো না। যে মেয়ে সম্মানীয় বাপ-ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের মান-ইজ্জতের মাথায় লাথি মেরে ব্যভিচারের পথে রসিক নাগরের সাথে বেরিয়ে যেতে পারে, যে মেয়ে ছোট বেলা থেকে আদর-যত্ন ক'রে মানুষ করার কৃতজ্ঞতা ভুলে যেতে পারে, সে মেয়ের মুখ দেখা উচিত নয়।'

আব্বা বলেছিল, 'তোমার মেয়ে হলে তুমি কী করতে?'

খালু বলেছিল, 'আমার মেয়ে হলেও আমি তাকে ঘর ঢুকতে দিতাম না।'

আব্বা বলেছিল, 'সে যা করেছে, তাতে সে তো কাফের হয়ে যায়নি যে, তাকে ঘর-ছাড়া করতে হবে।'

খালু বলেছিল, 'কাফের নাই-বা হল, তার অপরাধ ছোট নয়।'

আব্বা বলেছিল, 'কত ঘরে বেনামাযী ছেলে-মেয়ে রয়েছে, তাদের মুখ তো দিনরাত দেখা হয়, তাদের সাথে উঠা-বসা খাওয়া দাওয়া করতে হয়। অথচ বেনামাযী ব্যভিচারী থেকে বেশি বড় পাপী।'

খালু বলেছিল, 'বেনামাযী নামায না পড়ে কাফের হলেও তার পাপ আত্মকেন্দ্রিক পাপ। আর ব্যভিচারীর পাপ সামাজিক পাপ। আমাদের দেশে এ পাপে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তার কোন শাস্তি তো নেইই। আমরা যদি এমন পাপীদের সাথে সামাজিক বয়কট না করি, তাহলে সে পাপ রুখা যাবে কীভাবে? এইভাবে আরাম-সে বেরিয়ে যাবে, তারপর দু-এক মাস পর আরাম-সে বর-কনে হয়ে ঘর ঢুকবে, তাহলে তা দেখে সমাজের সব ছেলেমেয়েই তো ঐ পাপে সাহস ও উৎসাহ পাবে।'

আব্বা বলেছিল, 'অনেকে বেরিয়ে না গিয়েও ঘরে বসে ঐ পাপ করছে।'

খালু বলেছিল, 'নিশ্চয় যে পাপ প্রকাশ্যে জনসমক্ষে করে তার অন্যায় বেশি। স্ত্রী-মিলন তো পাপ নয়, কিন্তু তা প্রকাশ্যে করলে তা পাপে পরিণত হয়। তবুও যে ঘরে বসে ঐ পাপ করে, ধরা পড়লে তারও শাস্তি হওয়া

উচিত। যাতে কেউ সতী-বিবির বেশে অসতীর কাজে পা না বাড়ায়।'

আব্বা বলেছিল, 'যে পাপ করবে, সে ফল ভোগ করবে। তাতে অপরের নাক গলানো কী দরকার?'

এ কথাতেই খালু বেশি রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তাহলে আবার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে দিলে কেন? বেশ তো পালিয়ে গিয়ে আজীবন ব্যভিচার করত। তাতে তোমার নাক গলানোর কী দরকার ছিল।'

আব্বা বলেছিল, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।'

এর জবাবে খালু একটা খারাপ কথা বলেছিল, 'তাহলে শিউলির মা যদি অন্য কারো সাথে রাত কাটায়, তাহলে তুমি বুঝি তার পাপকে ঘৃণা করবে এবং তাকে ভালবাসবে? চোর চুরি করলে বুঝি পুলিশ তার পাপকে ঘৃণা করে এবং থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে ভালবাসে?'

আব্বা বলেছিল, 'কেউ অন্যায় করলে, তার ক্ষমা তো আছে?'

খালু বলেছিল, 'সব অন্যায়ের যদি ক্ষমা থাকত, তাহলে দেশের শাসন-ব্যবস্থা কী জন্য, থানা-পুলিশ কীসের জন্য?'

পরিশেষে আব্বা বলেছিল, 'তুমি গোঁড়া মানুষ, তোমাকে বুঝাতে পারব না।'

খালু বলেছিল, 'আর তুমি উদার মানুষ, তাই সকলের ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে মেনে নেবে।'

এরপর চাচা ও পাড়ার অন্যান্য লোকেরা বুঝিয়ে উভয়কে চুপ করিয়েছিল। তারপর থেকে খালু আর আমাদের বাড়ি আসে না, খালাকেও আসতে দেয় না।

তারপরেও তাকে বলা হয়েছিল, 'তুমি বড় অসামাজিক।'

খালু বলেছিল, 'পাপাচারী সমাজ-বিরোধীদের সাথে বয়কট করলে যদি কেউ অসামাজিক হয়, তাহলে আমি তাই।'

এ সব কথা মনে পড়লে লজ্জায় তার গৌরবর্ণ মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। রাজীবের সাথে আলোচনায় প্রায়শ্চিত্তের পথ খোঁজে। কিন্তু কোথায় সে পথ? যে কলঙ্কের ছাপ জীবনে লেগে গেছে, তা মুছে ফেলা কি সম্ভব?

'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।' তাই শরমে-লজ্জায় তারা কোন আত্মীয়-বাড়ি যায় না।

পবিত্র ভালবাসার মাধ্যমেও তারা একে অপরকে লাভ করতে পারত। যদি শিউলি ভালবাসা প্রকাশে তাড়াহুড়া না করত এবং ভালবাসার মানুষটির সাথে সাক্ষাৎ ক'রে মনে উঁকি দেওয়া নানা কথা বলার চেষ্টা না করত। মনে

মনে ভালবাসা থাকত এবং রাজীব বড় হয়ে মা-বাপ-ভাইয়ের মনকে জয় করত। অতঃপর অতি সহজে প্রত্যেকে প্রত্যেককে লাভ করত। কিন্তু ফল পাকার আগে খাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হতে গিয়ে ফলটি নষ্ট হওয়ারই উপক্রম হয়েছিল। মনের মানুষটি হাতছাড়া হয়ে যাবে---এই আশঙ্কা তাদের চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা অঙ্কিত হয়েছিল।

শিউলির প্রেমে ছিল তাড়াহুড়া। যেহেতু তার বয়স ছিল নাবালিকার, যদিও পরিবেশ-গুণে অনেক পূর্বেই সে সাবালিকা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রেমে সফলতা লাভের শীঘ্রতা সকল পক্ষকে সীমাহীন লাঞ্ছনার দ্বারপ্রান্তে এনে খাড়া ক'রে দিয়েছিল। অথচ ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করলে পবিত্রতার সাথে ভালবাসার বস্তু অনায়াসে ভোগের পাত্রে এসে যেত।

এই জন্যই জ্ঞানিগণ বলেন, 'কোন কিছুতে তাড়াহুড়া করো না। কারণ তাতে লাঞ্ছনা আসে। কেননা, যে তাড়াহুড়া করে, সে জানার পূর্বে বলে, শোনার পূর্বে বিচার করে, বুঝার পূর্বে উত্তর দেয়, ভাবার পূর্বে সঙ্কল্প করে, মাপার পূর্বে (কাপড়) কাটে, পাকার পূর্বে খেতে চায়, পরীক্ষার পূর্বে প্রশংসা করে এবং সত্যতা যাচায়ের পূর্বে দুর্নাম করে। আর যে এমনটি করে, সে অবশ্যই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয় এবং নিরাপত্তা হারিয়ে বসে।'

রাজীবের প্রেমে ছিল সততা ও সত্যতা। কিন্তু তার মধ্যে উপযুক্ততা ছিল না। উপযুক্ত ছাড়া উপযুক্ত জিনিসকে অধিকারভুক্ত ক'রে পেতে চাওয়া যৌক্তিকতার আওতাভুক্ত নয়। আর যা পাওয়ার মতো যোগ্যতা নেই, তা পাওয়ার জন্য হাত বাড়ালে শুধু বঞ্চিতই হতে হয় না, বরং লাঞ্ছিতও হতে হয়।

অবশ্য প্রেমিক-নায়ক বলতে পারে, 'ভালোবাসার মজা শিকারীর মত। শিকার তাড়া না করলে শিকারে মজা আসে না।' কিন্তু তাতে যে কত বড় ঝুঁকি থাকে, শিকার ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে গিয়ে তা হাতছাড়া হওয়ার ভয় থাকে, এমনকি জীবনেরও বাজি থাকে, তা বলাই বাহুল্য।

(২৮)

ভালবাসার সমীরণ-দোলনে শিউলি-রাজীবের যৌবন-তরু দোল খেতে লাগল। ভালবাসার প্রতীক ও ফল স্বরূপ তাদের কোলে একটি সুন্দর শিশুকন্যা এল। এবার শুধু ভালবাসা নয়, ভালবাসার সাথে মান-অভিমান, চাওয়া-পাওয়ার নানা হিসাব যোগ হতে লাগল। বিয়ের আগে ভালবাসা একাই থাকে, কেবল একজনকেই ভালবাসতে হয়। কিন্তু বিয়ের পরে সেই ভালবাসা বস্তুটির ভাগাভাগি হয়। দাম্পত্য-জীবনে অনেককে ভালবাসতে হয়। আর তা না হলে ভালবাসা হারাতে হয়।

এখন মেয়ে হয়েছে, তার চাহিদা আলাদা। মা-বাবা আছেন, তাঁদের দাবী-দাওয়া আলাদা। একটি গরীব ভাগ্যহীন বোন আছে, তাকেও বিস্মৃত করা চলে না।

এতদিন আলোক-লতার মতো মামাদের বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে জীবনধারণ ক'রে আসছে। ভুঁই লতার মতো মাটিতে কত লুটোপুটি খাবে আর? নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার সাথে সাথে উপায়ক্ষম হতে হবে। স্বাধীনভাবে থাকার মতো একটা মনের মতো বাসা বানাতে হবে। বড় হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তব বানাতে হবে।

আর তার জন্য ব্যবসার সাথে সাথে সে এল.আই.সির এজেন্সি নিল। তার ফলে তার ব্যস্ততা আরো বেড়ে গেল। কমে গেল শিউলির পাশাপাশি কাটানো সময়ের প্রশস্ততা।

বোনের সমস্যা দিনের দিন বেড়েই চলেছিল। তার প্রায় সমস্ত খরচ তাকে বহন করতে হচ্ছিল। তার উপর মা যখন-তখন এটা-সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে দিয়ে পাঠায়। তাতে বেটা চোখ-কান না করলেও বউ তো করবেই।

এখানেই হল মা-বোন ও বউ-এর পার্থক্য। অধিকাংশ মা নিজ সন্তানের এবং বোন তার ভাইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না। মায়ের কাছে সব সন্তান সমান। তার কাছে যা থাকে, তা সকলকেই সমানভাবে বিতরণ করতে চায়। সে উপার্জনশীল সন্তানবান পুত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করে না। অনুরূপ বোনও। কিন্তু বউ কেবল নিজেরটা ভাবে। নিজের স্বামী-সন্তানের কথা আগে ভাবে।

বোনের ব্যাপারটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হতে লাগল। কিন্তু খরচ বন্ধ ক'রে দেওয়া অথবা তাদেরকে বেশি কিছু দিতে আপত্তি করার মতো সাহস তাদের হল না।

কিন্তু কত দিন? একদিন রাজীব মুখ খুলল তার মায়ের কাছে। বলল, 'মা! এখন আমার বিয়ে হয়েছে। একটা মেয়েও হয়েছে। একটা বাড়িও করতে হবে। এবার বোনের খরচটা কমিয়ে দিলে হয় না?'

মা অবাক হয়ে বলল, 'বাঃ! এতদিন তো কিছু বলিস্‌নি। এ বুঝি বউ-মায়ের পরামর্শ?'

---কেন? আমার মাথায় কিছু নেই বুঝি, তাই বউয়ের পরামর্শ নিয়ে কথা বলতে হবে? তাছাড়া এতদিন বলিনি, বলার দরকার ছিল না। এতদিন বাড়তি খরচও ছিল না।

---বোনকে দেওয়াতে তোদের হিংসা হচ্ছে? তোর আব্বা আসুক বলছি।

দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি এল রাজীব। দেখল রান্না হয়নি। বাড়ির রোয়াকের এক পাশে মা এবং অন্য পাশে শিউলি মুখ ভারি ক'রে বসে আছে।

---কী হয়েছে? ঝগড়া?

মা বলতে লাগল, 'আমি তোদের জন্য কিছু করতে পারিনি। অতএব তোদের খাব না। আমি আলাদা হয়ে যাব। আমি তোদের সব ধ্বংস ক'রে দিচ্ছি, উড়িয়ে দিচ্ছি। আমার জন্যেই তোরা বাড়-উন্নতি কিছুই করতে পারছিস না। আসলে তোদের পৃথক হওয়ার মন।'

---এ সব কথা শিউলি বলেছে বুঝি?

---বলবে না আবার? বড়লোকের মেয়ে যে!

শিউলির কাছে গিয়ে রাজীব বলল, 'কী ব্যাপার শিউলি! রান্না করনি কেন?'

---মা বলেছে আলাদা ক'রে রান্না করতে, তাই আমি করিনি।

রাজীব জানে ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না। আলাদা হলে আরো দুর্বল হয়ে যাবে তারা। মায়ের কাছে গিয়ে সকাতরে বলল, 'এ কী বলছ মা! আলাদা কী? আলাদা হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।'

---আমি কি বুঝি না বলছিস? আমি কসম করেছি, এক সঙ্গে আর খাব না।

---আমিও বলছি শুনে রাখো, আমি শিউলিকে ওর বাপের বাড়িতে রেখে আসব। আমি হোটেলে খাব। তবুও এ বাড়িতে দু'জায়গায় রান্না হতে দেব না।

ইতিমধ্যে ছোট মামা হস্তক্ষেপ করল। সে বলল, 'বুবুকে নিয়ে আমি একটা প্লান করেছি। বুবু যদি আলাদা থাকে, তাহলে তোর বোনকে আর ওরা পাঠাবে না এবং খরচ-পাতিও চাইতে পারবে না। জানবে তোর মা-আব্বা টাকা কোথায় পাবে?'

কথাটি যেহেতু মায়ের সমর্থক হল, সেহেতু সে বলল, 'হ্যাঁ বেটা! এর জন্যই আমি আলাদা হওয়ার কথা বলেছি।'

---তাহলে এতে ঝগড়ার কী আছে?

---আসলে তুই যদি না মানিস, তার জন্য!

অথচ এখন সে মানতে বাধ্য। আসলে শকুনি মামার মতো চাল খাটিয়ে ছোট মামা মা ও বেটার মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি ক'রে দিল। শাশুড়ী-বউয়ে ঝগড়া, ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইল মামা।

এতে অবশ্য রাজীবের মনে একটা সন্দেহ ঢুকে গেল। সে শুনেছিল, প্রেমের বিয়ে বেশি দিন টিকে না। এ আবার সেই নাটিকার সূত্রপাত নয় তো?

সে জানত, ভালোবাসার আসল পরীক্ষা হয় বিবাহের পরে। 'নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু। পুরাতনে অম্লমধুর একটু ঝাঁঝালো।'

নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, বাসি হলেই টকে যায়।

প্রেমের বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী কথা বলে স্ত্রী শোনে, দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী কথা বলে স্বামী শোনে। আর তৃতীয় বছরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কথা বলে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শোনে!

অবশ্য পরবর্তীতে শিউলি সে সব অভিজ্ঞতাকে তার নিজের জন্য ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিল।

(২৯)

মামার-বাড়িতে বাস। তাতে আবার মা-বেটার দু'টো সংসার হয়ে গেল। তাতে মামীর যেন নাভিশ্বাস উঠছিল। যেন-তেন-প্রকারেণ তাদেরকে তাড়াতে পারলে তার স্বস্তি আসে। আর তার জন্য সে উত্তম সুযোগ ও বাহানার অপেক্ষায় ছিল। তাছাড়া তাদের প্রতি চিরদিনের হিংসাও ছিল। পাছে ভাগ্নে নানার জায়গা দখল ক'রে ভাগ দাবী ক'রে বসে, তাই তাদেরকে আগে থেকেই সরাতে পারলেই তাদের লাভ।

ইতিমধ্যে শিউলি আবার অন্তঃসত্ত্বা হল। নবম মাসে প্রসবের জন্য সে বাপের বাড়ি গেল।

এই অবসরে মামার সন্দেহ হল যে, রাজীব ক্যাশ থেকে কিছু ক'রে টাকা সরাচ্ছে। এক সময় এই অপবাদকে টোপরূপে ব্যবহার করল সে। কথা কাটাকাটির পর ঝামেলা সৃষ্টি করল এবং বাড়ি থেকে বের ক'রে দেওয়ার হুমকি দিল।

রাজীব বলল, 'মামা ! আমি আপনাদের নুন খেয়ে নিমকহারামী করতে

পারি না।'

মামা বলল, 'হালালি ক'রে থাকতে পারলি কৈ?'

সুতরাং মিথ্যা অপবাদ নিয়ে রাজীব বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। যতই হোক আব্বা তো। সংসার পৃথক হলেও সে ছেলের পক্ষ নিয়ে অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তা নিষ্ফল হল। সুতরাং তারাও বাড়ি ছেড়ে বের হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। একান্ত আপন যারা, তারা পর হয়ে গেল।

'জীবন-চাকা কলের মত ঘুরল জীবনভর,
সকাল-দুপুর আপন সবাই সাঁঝের বেলায় পর।'

'ছিল যারা অনুকূল, তারা হয়ে প্রতিকূল যায় চলে অকূলে ফেলিয়া।' কিন্তু তারা যাবে কোথায়? ভাবতে ভাবতে অবশেষে রাজীব একটি বাড়ি ভাড়া নিল। সেখানে আব্বা-আম্মাকে রাখল এবং শিউলির আবার দ্বিতীয় মেয়ে হওয়ার পর তাকেও সেখানে নিয়ে এল।

মামার বাড়িতে থাকার মানসিকতা রাজীবের ছিল না। কিন্তু আব্বা তখন শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর পেয়ে নিজের বাপের বাড়ি অল্প টাকার বিনিময়ে ভাইদেরকে রেজিস্ট্রি ক'রে দিয়ে এখানে বাস করছিলেন। যদিও তিনি জানতেন যে, 'শ্বশুর-বাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পর ঝাঁটার বাড়ি।' তবুও নিরুপায় অবস্থা তাঁদেরকে সেখানে বসবাস করতে বাধ্য করেছিল।

নতুন বাড়িতে এসে শিউলি বলল, 'আল্লাহ যা করে, ভালই করে। ভাড়া-বাড়ি হলেও নিজেদের মতো থাকতে পারব। অসময়ে মানুষ চেনা যায়। মামাদেরকে চেনা গেল।'

রাজীব বড় হওয়ার স্বপ্নঘোরে বলল, 'তোমরা চিন্তা করো না। আল্লাহ চাইলে কিছু দিনের ভিতরে আমি বাড়ি ক'রে ফেলব।'

ভাড়া বাড়িতে এসে এক সাথে রান্না হতে লাগল। মামার সাথে ঝগড়া হল ভাল হল, মা-বেটাতে ভাব হল। কিন্তু সে একান্নতা থাকল না বেশি দিন। আবার সেই বোনকে কেন্দ্র ক'রে শান্তি বজায় রাখার জন্য পৃথগন্ন পুনর্বহাল করা হল।

রাজীব তাতে বিমর্ষ হল না। কারণ সে নিরাশাবাদী নয়। মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ ও লাভ-নোকসানের টানাপোড়েনের সময় মানুষের মনে যখন ক্ষতির দিকটাই স্থান পায়, তখনই সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে যে মানুষ

আশাবাদী হয়, তার দুশ্চিন্তা আসে না।

সে নিজের মনকে বুঝাতে লাগল, স্ত্রী শিউলিকে রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে বর্তমানকে ভুলাতে লাগল। প্রায় রাতে তারা গাইতে লাগল,

'সময়ের স্রোতে আসে জোয়ার-ভাটা,
সুখের ফুলেও থাকে ব্যথার কাঁটা।
দুঃখের পরে জানি দেখা দেবে সুখ,
মনে যদি আশা থাকে ভাঙ্গবে না বুক।'

অর্থ সঞ্চয়ের জন্য রাজীব তার শ্রম বাড়িয়ে দিল। সারা সারা দিন দোকান, তারপর এল.আই.সি ক'রে প্রত্যহ প্রায় রাত্রি এগারটা-বারটায় বাড়ি ফিরতে লাগল। এর জন্য সে শিউলির কাছে ধিক্কার শুনল। কিন্তু তা না করলে তো উপায় ছিল না। কষ্ট না করলে কি ইষ্ট লাভ হয়?

পিঠ বাঁকানো ছাড়া পাহাড়ে ওঠা সম্ভবই নয়। সফলতার পর্বত-শিখরে উঠতে হলে পিঠকে বাঁকাতেই হবে।

সফলতার পথ মই-এর মত, যা পকেটে হাত রেখে চড়া যায় না।

সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ব্যর্থতা অতিক্রমের পরই আসে সফলতা।

সে মেহনত করে, কারণ জ্ঞানী লোকেরা কখনো পরাজয়ের পর নিরাশ হয়ে অলসভাবে বসে থাকে না। তারা চেষ্টা করে, যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে।

সে জানত, পড়ে যাওয়াটা মানুষের বিফলতা নয়, বিফলতা হল যেখানে সে পড়ে যায়, সেখানেই পড়ে থাকাটা।

সে ব্যর্থতাকে ভয় করে না। কারণ, ব্যর্থ লোকরাই ব্যর্থতাকে ভয় পায়। আর বিফলতা দুর্বলদের পথ-সমাপ্তি, কিন্তু সবলদের পথের শুরু। সুতরাং সেই পথেই সে অগ্রসর হতে লাগল।

দেখতে দেখতে এক বছর গত হয়ে গেল। রাজীব এবারে জায়গা ক্রয় ক'রে ঘর-বাড়ি বানিয়ে নিল। তার বড় হওয়ার সাধ অনেকখানি পূরণ হল। যদি মানুষের মনে লোভ না থাকে, তাহলে তাদের যে সুখ, তাই যথেষ্ট। যে সংসারে বড়লোকের মেয়ে সুখিনী, সে সংসার নিশ্চয়ই সুখের সংসার।

দেখার মতো একখানা বাড়ি করলেই তা মানুষের চোখে লাগে। লোক তখন বাড়ি-ওয়ালাকে বড় ভাবতে লাগে, টাকা-ওয়ালা ও বিভবশালী ধারণা করে। ফলে সমাজে তার মান বাড়ে, পজিশন বাড়ে। আত্মীয়দের মাঝেও তার

প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। যারা পাশ দিয়ে পার হয়ে গেলে কুশল জিজ্ঞাসা করত না, তারা তখন গায়ে পড়ে সালাম দেয়। তাদের বাড়ি না গেলে বলে, ‘আমরা গরীব মানুষ, আমাদের বাড়ি আসবে কেন বাবা!’

সুখ এমনই জিনিস, তার ভাগী হতে সবাই চায়। কিন্তু দুঃখের ভাগ নেওয়ার মতো লোক পাওয়া যায় না। গরীব হওয়ার দরুন যারা ‘জামাই’ করতে চাচ্ছিল না, বড়লোক হওয়ার পর তারাই আবার ঐরূপ ‘জামাই’ পেতে আগ্রহী হয়।

শিউলিও এখন বাপের বাড়িতেও কদর পেয়েছে। কারণ, আর যা হয়েছে, তা হয়েছে, তার ‘চয়েস’ ভাল হয়েছে। এখন তার চয়েসের সবাই তারীফ করে। কোন্ অদৃষ্টের চক্ষু দিয়ে সে রাজীবকে দর্শন ক’রে পছন্দ করেছিল যে, তখন সে একজন দরিদ্র গরীব ছেলের মাঝেও সুখের পদ্ম দেখতে পেয়েছে!

যে সুখ সে পেয়েছে, তা তার জন্য যথেষ্ট। সে চায় না অতিরিক্ত সুখ। তার ভয় হয়, অতিরিক্ত কিছু চাইতে গিয়ে আবার রিক্ত হতে না হয়। দুঃখের পরে সুখ বড় আমেজের হয়, কিন্তু সুখের পরে দুঃখ এলে তা হয় বড় অসহনীয়। তাই সে প্রাণাধিক স্বামীকে সর্বদা পরামর্শ দেয়। সুখ-বিজয়িনী সে, হারতে মোটেই চায় না।

(৩০)

ইচ্ছা হলেই তো সব কিছু হয়ে যায় না, থেকে যায় না। সুখ-দুখ দু’টি ভাই। পাশাপাশি থাকে, পাশাপাশি আসে-যায়। পথের মাঝে চড়াই-উতরাই আছে। মানুষের জীবনেও উত্থান-পতন আছে।

দুই বছরের মধ্যে রাজীবের সুখ-উদ্যানে বৈশাখ মাসের একদিন আগে কাল-বোশেখি ঝড় দেখা দিল। একত্রিশে চৈত্র রাজীব এবং পাশের দুই দোকানী মিলে শহরে মিষ্টি কিনতে গেল। কাল পহেলা বৈশাখ। হালখাতা করা হবে। নববর্ষে সাদর সম্ভাষণের সাথে নতুন খাতার নিমন্ত্রণ দিয়ে মিষ্টি না খাওয়ালে ধারে পড়ে থাকা টাকা আদায় হয় না। অনেক টাকা পড়ে আছে খদ্দেরদের হাতে।

মিষ্টি কেনা হয়ে গেছে। এমন সময় মোবাইলে ফোন এল, ‘রাজীব! তোর বোন বিষ খেয়েছে, সত্বর তার বাড়ি চলে যা।’

সাথী দোকানীদের সাথে মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়ে বোনের গ্রামের বাস ধরল।

সেখানে পৌঁছে দেখল, লোকে লোকারণ্য। বোন মারা গেছে। তবে আত্মহত্যা নয়, পরিকল্পিত বধূহত্যা।

কিছুক্ষণের মধ্যে লাশ পুলিশে তুলে নিয়ে গেল।

দোলাভাইয়ের নামে পুলিশ-কেস হল। অবশ্য পরবর্তীতে সে যামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল।

আগামী কাল সকালে পোস্টমার্টম হবে। তারপর লাশ পেলে মাটি হবে।

মেয়ে মারা যাওয়ার ফলে তার মা শোকে কাতর ও অস্থির হয়ে পড়ল। রাজীবও মুষড়ে পড়ল। দুঃখভরা হৃদয় নিয়ে রাত্রি-যাপন ক’রে সকালে থানায় উপস্থিত হল লাশ নেওয়ার জন্য।

আত্মীয়-স্বজন আসবে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মামা বলল, ‘রাজীব! রান্না আমাদের ওখানে হবে। তোকে খরচ করতে হবে না। তোর কর্নেল খালু খরচ দেবে বলেছে।’

কিন্তু রাজীব বলল, ‘আমার বোন মারা গেছে। সমস্ত খরচ আমি করব। যাকে তার জীবনের খরচ যুগিয়ে এলাম, তার মরণের খরচ যোগাতে পারব না? এ নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না।’

মাথা উঁচু রাখার কথা সে মুখে বলল বটে, কিন্তু তার পকেটে আসলে পুরো খরচ বহন করার মতো পয়সা নেই। তবুও এক বন্ধুর নিকট থেকে অতিরিক্ত পনের হাজার টাকা ধার নিয়ে বোনের দাফন-কার্য সমাপন করল এবং তারপর বিদআতী চাহারমও করল। হালখাতা আর করা হল না। মিষ্টিগুলো নষ্ট হয়ে গেল। আর এই আচমকা ঝড়ে তার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেল। উপরন্তু দোকানের ধারে পড়ে থাকা প্রায় এক লক্ষ টাকার মধ্যে এক টাকাও আদায় করতে পারল না।

তারপরেও মেয়ে মারা যাওয়ার শোকে মায়ের রোগ-বৃদ্ধি পেল। তার চিকিৎসায় আরো দশ হাজার টাকা ঋণ করতে বাধ্য হল সে।

বাড়ি তৈরির সময়কার ইট-সিমেন্টের এখনো ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ ঘাড়ে আছে।

এই সকল ঋণ পরিশোধে চাপ এলে সে সূদের উপর ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করল। ফলে ঋণে ঋণে সে এমন জর্জরিত হল যে, তার অবস্থা হয়ে গেল খালি থলের মতো, যে থলিকে দাঁড় করানো যায় না।

ওদিকে দোকানটা চলছিল। কিন্তু শরীক মামা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে দোকান

যাওয়া একেবারেই বন্ধ ক'রে দিল। অতঃপর সুস্থ হয়েও সে আর দোকানে যাওয়া শুরু করল না। এখন রাজীব একা দোকান সামাল দিতে গিয়ে এল.আই.সিতে সময় দিতে পারে না। যার ফলে ইনকাম কমতে লাগল।

এক্ষণে সে লজ্জা-সংকোচ দূরে ঠেলে ফেলে মামাকে বলল, 'আপনি দোকানে এসে বসুন। আমি একা সর্বদা সময় দিতে পারছি না।'

---তুই-ই বস। আমি আর বসতে পারব না।

---তাহলে পুঁজি যখন সমান সমান, লভ্যাংশ ভাগ যখন আধাআধি, তাহলে আমার পরিশ্রমের জন্য আমাকে একটা পারিশ্রমিক দিন।

মামা রাজীবের দুরবস্থা অনুমান করতে পেরেছিল। সুযোগ বুঝে সব শেষ হওয়ার আগে নিজেরটা সামলাতে চাইল। সে বলল, 'আমাকে আমার পুঁজি ফেরৎ দে, আমি আর ব্যবসা করব না!'

রাজীব অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'আর যে সব বাকী পড়ে আছে, সেগুলি কী হবে?'

---সে তুই বুঝবি। আমি কি তোকে বাকী দিতে বলেছিলাম?

---বাকী না দিলে তো আর ব্যবসা চলে না।

---তুই সেগুলো আদায় ক'রে নিস্।

কেউ কারো অমৃতময় পানীয় প্রত্যাখ্যান করে না, কিন্তু জীবনের গরল মানুষকে একাই পান করতে হয়। এ নিয়ে আবার অশান্তি শুরু হল মামার সাথে। কিন্তু প্রধান ভূমিকায় ছিল মামী। সে ছিল এই বিবাদের মূল পরিচালিকা।

বিবাদ রেখে লাভ কী। যার বিল্ডিং ভেঙ্গে সবকিছু হারাতে চলেছে, সে আর ইটের ভাগ নিয়ে প্রাক্তন আশ্রয়দাতাদের সাথে বিবাদ করবে কেন? কাঁদলে সে একাই কাঁদবে, তার কোন আত্মীয়কে কাঁদাবে কেন, কাঁদতে নেবে কেন? সুতরাং মামার মূল পুঁজি সে কোনভাবে ফেরৎ দিয়ে দিল। আর তার ফলে দোকানের মাল কমতে লাগল। ব্যবসার তরতাজা ফুল ধীরে ধীরে শুকাতে লাগল।

ঋণের সূদ বাড়তে লাগল। এল.আই.সির পলিসি হোল্ডারদের ইনভেস্ট্ করা ত্রিশ হাজার টাকা অনাদায় থাকায় তার রসিদও সে দিতে পারেনি। ফলে সে টাকাও যোগ হল ঋণরূপে।

এখন ঋণের রণে সে পরাভূত অশ্বারোহী। অসিতে ধার নেই। অশ্বে বল

নেই। তার কোমরে জোর নেই। দুঃখ পাবে বলে আব্বা-আম্মা ও শিউলিকেও বলতে পারে না এ সব ঋণের কথা। একা সইতেও বুক ফেটে যায়। সময়ে তার বুদ্ধি কাজ করে না। চোখে যেন সরিষার হলুদ ফুল দেখে।

ব্যাংকের কিস্তী জমা দিতে পারে না বলে নোটিশও এসে গেল। তাতে আশাবাদী যুবক যেন নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে লাগল।

কাউকে না জানালেও মানুষ ভালবাসার জীবন-সাথীকে জানিয়ে থাকে। কিন্তু রাজীব ভাবল, তার কাছে বললে সে যদি আব্বা-ভাইয়ের কাছে সহযোগিতা কামনা ক'রে বসে, তাহলে সেটা তার অপমান হবে। ধনের লোভে যখন তাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করেনি, তখন ধনের জন্য তাদের কাছে ছোট হবে কেন?

সুতরাং শিউলিকে ব্যবসা ভালরূপে না চলার কথা বলল। শিউলি মামার কেটে পড়ার খবর জানে। তার ধারণা হল, নতুন বাড়িতে মীলাদ পড়ানো হয়নি বলে হয়তো বর্কত উঠে গেছে। সুতরাং বাড়িতে মীলাদ পড়াতে হবে।

তার ভাবী দাতা সাহেবের খুব ভক্ত। সে তাকে পরামর্শ দিয়েছে, পাথরচাপুড়ি গিয়ে নযর মেনে আসতে হবে। সেখানে চাদর চড়ালে বর্কত ফিরে আসবে।

আব্বার মত হল, আজমীর শরীফ গিয়ে নযরানা দিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু ফারাযী পাড়ার বন্ধু নাঈম বলল, 'অন্ধ-বিশ্বাসীদের ওসব কথা শুনিস্ না। একমাত্র আল্লাহর কাছে আর্জি জানা। পরীক্ষা তাঁরই, উদ্ধারও করবেন তিনিই।'

রাজীব তো খরচের বেড়ে পড়েই আছে, সেও আর নতুন ক'রে কোন খরচ বাড়াতে চায় না।

(৩১)

নোটিশ যখন এসেছে, তখন ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজার বাবুকে দেখা তো করতেই হবে। সুতরাং একদিন সকালে রাজীব ব্যাংকে গেল।

---আমার নাম রাজীব স্যার।

---হ্যাঁ, তুমি সুন্দর কারবার করতে করতে আমাদের সাথে কারবার যে একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছ! আমাদের স্টাফের কাছে তোমার সব কথা শুনেছি। পূর্বতন ম্যানেজার তোমার সাথে অন্যায় করেছে। সে যাই হোক,

এখন যদি তুমি আমাদের বকেয়া লোন এক কিস্তীতে পরিশোধ করতে পার, তাহলে তোমাকে আবার নতুন লোন দেব। তবে শর্ত হল মর্টগেজ।

---ঠিক আছে আমি আমার বাড়ির দলীল মর্টগেজ দেব। আপনি কত লোন দিতে পারবেন?

---দুই লক্ষ টাকা।

রাজীব যেন একটা সুবর্ণ সুযোগ আবার হাতে পেল। এই লোন পেলে সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ ক'রে বাকী পুঁজিরূপে নিয়োগ ক'রে দোকানটাকেও চাঙ্গা করতে পারবে। অতএব সে একুশ হাজার টাকা বকেয়া কিস্তী পরিশোধ ক'রে দিল এবং লোনের জন্য দলীলের জেরক্স-কপি মর্টগেজ দিয়ে সমস্ত পেপার্স প্রস্তুত করল।

যেদিন লোন পাবে, সেদিন আসল কপি জমা দিতে হবে। কিন্তু কোথায় সে সোনার হরিণ? কবে দেখা দেবে? দিনের পর দিন পড়তে থাকে। লোন আর হাতে আসে না।

অর্থনৈতিক অবস্থা তো শোচনীয় বটেই। তার উপরে আশায় আশা ভঙ্গ তাকে দগ্ধ করতে লাগল।

কিছু বন্ধু তাকে অন্য ব্যবসা করার পরামর্শ দিল। দুই বন্ধু মহারাষ্ট্রের পুনা শহরে মুরগী ব্যবসা করত। তাদের সঙ্গে ফোনে তার দুরবস্থার কথা আলোচিত হলে, তারা তাকে ওখানে যেতে বলল। উদ্দেশ্য, 'এখানকার ব্যবসা দেখে যাবি, আর কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে ব্যবসায় লাগাবি।'

'আসুক যত বাধা পথে, হারবে না সে কোন মতে।' সুতরাং সে এক সপ্তাহের জন্য পুনা চলে গেল। কিন্তু এটা ছিল তার জীবনের আর একটি বড় ভুল। আসলে সে বাড়িতে মনোমালিন্য ক'রে গিয়েছিল। বাড়ির লোক পরে জানতে পারলে কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল। আর গ্রামের লোক সে খবর পেয়ে রটিয়ে দিল যে, সকলের টাকা মেরে দিয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে।

ফোনে যোগাযোগ হলে শিউলি তাকে কুলের কথা খুলে বলল এবং পরামর্শ দিল যে, তুমি এখনই বাড়ি ফিরে এসো, নচেৎ মান রাখা দায় হয়ে যাবে।

ফিরে এল পরের দিন। বাজারে গিয়ে দোকান খুলল। লোকের ভুল ভাঙ্গলে মুখে ছাই পড়ল। অতঃপর সে সকল পাওনাদারকে বুঝিয়ে পুনরায় পুনা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

আব্বাকে বুঝিয়ে-মানিয়ে দোকান চালানোর ভার দেওয়া হল। তাঁকে বলল,

'আপনি দোকানটা খুলে বসবেন, যা পারবেন বেচা-কেনা করবেন। আর অর্ডার দিয়ে মাল আনিয়ে নেবেন।'

শ্বশুরকে দেওয়া হল ব্যাংকের লোনের দায়িত্ব। লোন আসার খবর পেলেই যেন তিনি তাকে জানিয়ে দেন। সে জানতে পারলেই বাড়ি ফিরে পুনরায় দোকান চালাবে।

সবাই সম্মত হল। সে পুনা চলেও গেল। সেখানে বন্ধুরা তাকে দোকানের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। সে একটা সহযোগী কর্মীকে নিয়ে দোকান খুব সুন্দরভাবে চালাতে লাগল। এক মাস পর দোকানের মালিক তার ব্যবসার হাত পাকা ও লাভের হার বেশি দেখে তাকে ভালবাসতে লাগল। সে বলল, 'এই দোকানের বয়স দুই বৎসর। কিন্তু এই এক মাসের মতো বিক্রি এর আগে কখনো হয়নি। তুমি কি আগে মুরগী ব্যবসা করেছ নাকি?'

বন্ধুরা বলে দিল, 'ওর কাপড়ের দোকান আছে। ও একজন পাকা ব্যবসাদার!'

আসলে যার চেহারা সুস্মিত, মুখ মিষ্টি, ভাষা অমিয় ও ব্যবহার অমায়িক, সে সাধারণ লোক হলেও তার বন্ধু হয় বেশি। যুবক হলে যুবতী জোটে বেশি। আর ব্যবসাদার হলে খদ্দের হয় বেশি। এটাই বাস্তব।

সুতরাং রাজীবের চরিত্রটাই এমন ছিল। তবে সেই সাথে সফলতার ভাগ্য চাই বৈকি?

মুরগীর ব্যবসা চলতে লাগল ভাল। লাভও ভাল। কিন্তু তাতে বর্কত ছিল না। সবই যেন 'বারে পড়ে ঢোঁড়ে খায়।' রাজীব ভাবত, এ ব্যবসা হালাল ব্যবসা নয়, তাই হয়তো তার উপার্জনে বর্কত পরিদৃষ্ট হয় না। তখন সে যত রকমের সন্দিগ্ধ আচরণ ছিল, সব বর্জন করল। যেমন মাংসে পানি মিশিয়ে ওজন করা ত্যাগ করল। ওজনে কম দেওয়া ছেড়ে দিল। মিথ্যা বলে খদ্দের বুঝানো ত্যাগ করল। ইত্যাদি।

একদিন তার দোকানে খাঁচিতে চার পিস মুরগী মারা গেল। সাথী কর্মীটাকে বলল, 'ওগুলো তুলে ফেলে দাও।' সে ফেলতে লাগল। কিন্তু ঠিক সেই সময় মালিক এসে পড়লে সে প্রশ্ন করল, 'মুরগীগুলো ফেলছে কেন?'

রাজীব বলল, 'কারণ ওগুলো মারা গেছে। আর মরা মুরগী বিক্রি করা বৈধ নয়।'

মালিক অমুসলিম ছিল। সে বলল, 'আরে যবাই ক'রে মেরেই তো সবাই

খায়। সুতরাং মরা মুরগী গোশ্ত বানিয়ে খেলে বা বিক্রি করলে দোষ কোথায়? নচেৎ মিশিয়ে দাও জ্যান্ত মুরগীর মাংসের সাথে মরা মুরগীর মাংস। কেউ বুঝতে পারবে না।'

---না মালিক! এটা ঠিক হবে না। লোককে মরা খাওয়ানো ঠিক হবে না।

---কিন্তু অনেকে তো মরা মুরগী খায়। যারা খায় তাদেরকে বিক্রি কর।

---না, না। আমাদের ধর্মে মরা মুরগী বিক্রি করা হারাম।

---তুমি এখানে পয়সা কামাতে এসেছ, নাকি হারাম-হালাল দেখতে। হারাম ছাড়া পয়সা হবে না। আমি চাই, আমি কিছু কামাই, তুমিও কিছু কামাও।

কিন্তু মালিক কোন মতেই রাজীবকে মানাতে পারল না। তাতে মালিকের রাগ হল না, বরং তার প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পেল।

তা দেখে বন্ধুদের হিংসা হতে লাগল এবং মালিকের কাছে তারা তার নামে নানা অভিযোগ করতে লাগল। মালিক সে কথা রাজীবকে জানাতে লাগল। কারণ, সে জানত, সেসব অভিযোগ হিংসাবশতঃ করা মিথ্যা কথা।

তার অমায়িক ব্যবহার ও বেশি ক্রেতা-সংখ্যা লক্ষ্য ক'রে অন্য এক মালিক তাকে অন্য একটি দোকান দিল। এ দোকান ছেড়ে সে নতুন দোকানে চলে যেতে চাইল এবং তার উপকারী বন্ধুদেরকে পূর্বের মতো তাদের দোকানের দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু মালিক রাজি হল না। সুতরাং বিশেষ চুক্তিতে সে উভয় দোকান চালাতে থাকল এবং আরো পরে সে আরো দু'টি মোট চারটি দোকানের দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। পার্টনারশিপে একটি জুসের দোকানও ক্রয় করল সে। তার বড় হওয়ার সেই রঙিন স্বপ্ন আবার তার মানসপটে রঙ ছড়াতে লাগল।

কিছুদিন পর সে শিউলিকে সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে সে দেখল, তার প্রেমিকের প্রতি কেবল একা তারই লোভ ছিল না। বরং যারা ভাল হয়, সুপুরুষ ও প্রতিভাবান হয় অথবা কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হয়, তাদের প্রেমিকা সবাই। যে কোন ভাষা, যে কোন দেশের মেয়ে সেই শ্রেণীর যুবকের প্রেমে পড়তে পারে।

রানী নামক একজন মারাঠী যুবতী, সে শিক্ষিতা ও চাকুরিজীবিনী ছিল। তার বেতন ছিল পঁচিশ হাজার টাকা। সে মুরগী কিনতে প্রায় প্রত্যেক দিন দোকানে আসত। কিন্তু মুরগী কেনার সাথে সে রাজীবের প্রেমও কিনে

ফেলেছিল। তলায় তলায় রাজীবের প্রেমে পড়েছিল সে। অবশ্য বন্ধুরাই রহস্যছলে তার মধ্যে এক তরফা প্রেমের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। পরিশেষে সে তাকে বিয়েও করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজীব তার দাম্পত্যের খিয়ানত করতে পারেনি। যেহেতু সে শিউলিকে ভালবাসত।

কিন্তু শিউলি তাদের আচরণ দেখে সন্দেহে পড়ে গেল। হঠাৎ রাজীব দেখে, তার মুখ ভারি।

---কী ব্যাপার? মুখ ভারি কেন?

---কৈ না তো!

---আমি বুঝতে পারছি, তুমি স্বাভাবিক নও। নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

---রানীর সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

---এমনিই দোকানদার-খদ্দেরের যে সম্পর্ক হয়।

---না, আরো কিছু। আমি সব শুনেছি।

---কী শুনেছ তুমি?

---তুমি ওকে ভালবাস।

---ভুল বুঝো না আমাকে। আমি ওকে ভালবাসলে তোমাকে এখানে আনব কেন?

---বেটাছেলেদেরকে কোন বিশ্বাস নেই। রূপ ও ধন দেখে পটে যেতে পারে।

---বেটিছেলেদেরকেই বা বিশ্বাস কোথায়?

বুঝেও হয়তো বুঝল না শিউলি। মন ভারি করেই সংসার করে। সেদিন থেকে সে যেন অন্য মেয়ে। শিউলির পাপড়ি যেন ঝলসে গেছে। রাজীব তার মন পেতে চায়। কিন্তু সে তার অবিশ্বাস দূর করতে পারে না। এক রাত্রে খুনসুটির পর শিউলি বলতে লাগল,

'দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণ-মন-দেহ।
আজ সে হৃদয় নাই যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।।'

রাজীব বিশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমার পূর্বের মতোই সেই মন, সেই প্রেম, সেই আকর্ষণ কেবল তোমার প্রতিই আছে।'

---তাহলে ওর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে।

---ও যদি গায়ে পড়ে কথা বলে, তাহলে তো বলতেই হবে। তাছাড়া সে একজন ভাল কাস্টমার। আমি তার সাথে ভাল ভাষা বলি, ভালবাসা করি না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার শিউলি। এত বড় বিশ্বাসঘাতক আমি নই।

এরপর শিউলির ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার দোকান চলছিল নিজ উন্নয়নশীল গতিতে। কিন্তু ভাগ্য যার সঙ্গ দেয় না, তার সব স্বপ্নই ভঙ্গ হয়। বাড়িতে আব্বা দোকান খোলা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। কারণ, দোকান খুলে বসলে পাওনাদাররা তাঁর কাছে পাওনা চায় এবং নানা কথা শোনায়। তাছাড়া তাঁর দেহে নাকি জ্বিন আশ্রয় করেছে, সে তাঁকে দোকান খুলতে দেয় না।

এ কথা ফোনে শুনে রাজীব কাঁদতে লাগল। দুর্দিনে কেউ তার সাথ দেয় না। স্বপ্ন বাস্তব করার পথে কেউ তার সাথী হয় না। এমনকি জন্মদাতা বাপও না। পরিশেষে জ্বিনও তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল? অবশ্যই শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সে কি মানুষের ভালাই দেখতে পারে?

কিছুদিন পর বসবাসের অসুবিধার কারণে শিউলি স্বামীর সঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হল। তাছাড়া মেয়ে দু'টির পড়াশোনার সমস্যাও ছিল। তাই এক সময় সে বাড়ি ফিরে এল।

কয়েক দিন পরেই ফোন এল শিউলির। সে বলল, 'দেখো, রানী যেন তোমার হৃদয়-রানী না হয়ে যায়।'

---তুমিই আমার হৃদয় রানী। তুমিই আমার মন আকাশের চাঁদ। এক আকাশে দুটো চাঁদ দেখেছ কোন রাত্রে?

---চাঁদ দেখিনি, তবে তারা দেখেছি অসংখ্য।

---তুমি তারা নও শিউলি! তুমি আমার চাঁদ। পূর্ণিমার চাঁদ।

---তাই যেন থাকি। আর তুমি বাড়ি এসে বাড়ি বিক্রি ক'রে ঋণ শোধ ক'রে যাও। আমরা চাই না, তোমার নামে কেউ কোন খারাপ কথা বলুক।'

ঋণ যেন মাথায় ঠুকা আলপিন। ঋণ রাখা বড় দোষ, পরে হয় আফসোস। এখন সেই সময় এল। রাজীব বলল, 'কিন্তু এখানে আমার ব্যবসা জমে উঠেছে। আমি এখন পজিশনের পথে উন্নয়নশীল। আর কিছু দিন সময় পেলে সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ ক'রে আসব। আবার আমি পুরনো সচ্ছলতায় ফিরে যাব। বাড়ি বিক্রি করার প্রয়োজন পড়বে না। আমি কত মেহনত ক'রে ঐ বাড়ি বানিয়েছি। তা বিক্রি করলে আর বানাতে পারব কি না সন্দেহ।'

কিন্তু বাড়ির লোকে কোন কথাই মানতে চাইল না। ফোনের উপর ফোন

এসে তাকে একই কথা বলে, 'বাড়ি বিক্রি ক'রে ঋণ শোধ ক'রে দাও।'

এদিকে বন্ধুদের হিংসা বাড়তে লাগল। পরিশেষে একদিন তাদের দেওয়া দোকান তাদেরকে ফিরে দিতে হল। অন্য এক দোকানে কাজ করলেও তাতে উপার্জন কম হয়ে গেল। ওদিকে পাওনাদারদের চাপ ও কটূক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাড়ির লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ব্যাংকের লোনের কোন খবর ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই সে একদিন বাড়ি এসে সেই 'ছোট্ট একটি আশা, স্বপ্নের একটি বাসা'খানি মাত্র আড়াই লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় ক'রে দিল। ঐ সময় যার দাম তিন লক্ষ টাকার উপর ছিল।

সে টাকা দিয়ে পাওনাদারদের দেনা পরিশোধ করল। বাকী টাকা দিয়ে একটা মাটির বাড়ি কিনল। সেখানেই রাখল মা-বাপ, স্ত্রী ও দুই কন্যাকে।

জীবনটা নাগরদোলার মতো, কখনো উপরে ওঠে, কখনো নিচে নামে। বহু মানুষের জীবনেই এ খেলা চলতে থাকে। মেঘ ও রৌদ্র---এই দুইয়ে মিলেই তৈরি হয় রঙধনু। মানুষের জীবনও কোন ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও আছে সুখ-দুঃখের মিশ্রণ, ভালো-মন্দের যোগ, অন্ধকার ও আলোর বিচিত্রতা।

কিন্তু তাতে রাজীব মুষড়ে পড়েনি। স্বামী-প্রাণা শিউলিও হিম্মত হারেনি। সেও আছে স্বামীর সাথে। তার কাঁধে কাঁধ না মিলাতে পারে, মনে মন তো মিলিয়ে আছে।

রাজীব জানত, জীবন হল সাইকেল চালানোর মত। যতক্ষণ প্যাডেলে পা রেখে চালানো যাবে, ততক্ষণ চালক সাইকেল হতে পড়ে যাবে না। কিন্তু প্যাডেল থামালেই পড়ে যাবে।

সুতরাং জীবনের পথে চলতে সে আবার পুনা ছুটল। ধীরে ধীরে চললেও আগের দিকেই পা বাড়ায়, পিছনের দিকে একটি পাও ফেলতে রাজি নয় সে।

কিন্তু শিউলির মনে রানী-রাজীবের ব্যাপারে সন্দেহের শিকড় তখনো নির্মূল হয়নি। তাছাড়া উপার্জনও আগের মতো ছিল না। সুতরাং সে পুনরায় বাড়ি ফিরে এল।

তখন জাফর ছিল সঊদী আরবে। তার সঙ্গে কথা হলে ছয় মাসের মধ্যে সে ভিসা দেওয়ার আশা দিল। শ্বশুর ও শিউলির মত ছিল সঊদিয়া যাওয়ার ব্যাপারে। সুতরাং সে কাপড়ের বন্ধ দোকানটিও বিক্রি ক'রে দিল।

কিন্তু ভিসা আসার আশায় দিন কেটে যায়, জাফরও আসে না, ভিসাও না। যখনই রাজীবের গাছ ভরে আশা-মুকুল আসে, তখনই হতাশার কুয়াশা এসে

সব ঝরিয়ে দেয়।

রাজীবের অবস্থা এমন ছিল যে, 'ডুবুডুবু করি ডুবিয়া না মরি, উঠিতে নারি যে কূলে।' বড় হওয়ার স্বপ্নের হয়তো নিশাবসান হয়ে যাবে।

নিজ প্রদেশের রাজধানী কলকাতা। সেখানে গিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করা যাক একবার। সেখানে নিজের গ্রামের লোক ছিল। তার সাথে যোগাযোগ ক'রে এক কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি পাওয়া গেল। বেতন মন্দ নয়। সেখানে এক সপ্তাহ কাজ করার পর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা বিশেষ লোকের। তিনি বললেন, 'রাজীব! তুমি কি আই.সি.আই.সি.আই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে রিসেপ্সনের কাজ করতে পারবে?'

রাজীব জানত না, সেখানে কী ডিউটি করতে হবে। তবুও মনের বলে সে বলেই ফেলল, 'হ্যাঁ স্যার পারব।'

সুতরাং নিকো-পার্কের নিকটে ইনফিনিটি বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলায় পাঠিয়ে দিল। সেই বিশাল অফিসে কাজ বুঝে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে লাগল।

ভিসার আশায় থাকতে থাকতে এক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'তে রিসেপ্সনিস্ট্ পদে ভ্যাকান্সির বিজ্ঞাপন দেখতে পেল। সেখানে ইন্টারভিউ-এ এক চান্সে উত্তীর্ণ হয়ে ডাইমন্ডহারবার ব্রাঞ্চে পোস্টিং গ্রহণ করল। চাকরি জীবনে এ যাবৎ বেশি বেতন এখানেই পেতে থাকল। তার পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুণ সে বেশ কীর্তিত্বের সাথে কাজে দক্ষতা ও সফলতা প্রদর্শন করতে পারল। সেই সুবাদে সে সেখানকার ম্যানেজার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল।

কিন্তু সেটাও তার স্বপ্ন বাস্তব হওয়ার মতো কিছু ছিল না। চাতক পাখির বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার ন্যায় রাজীব ভিসার আকাশের দিকে তাকিয়ে জাফরের অপেক্ষায় থাকল।

(৩২)

জাফরের আসতে দেরি দেখে সে নিজে এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে বড় হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব করার লক্ষ্যে ম্যালেশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু বাড়ির লোকে আরবের দিকে ঝোঁক। দিল্লি অফিসে এসে দুবাইয়ের ভিসা নিতে গিয়ে মনের গতি আবার পাল্টে গেল। একটা সঊদী ভিসা আছে। হাসপাতালে রান্নার ভিসা। কোন কাজ ছোট নয় তার কাছে। সুতরাং দ্বিধা না ক'রে টাকা-পয়সা জমা দিয়ে ভিসা লাগিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়ির সকলে খুশি। মুসলমান তো। মক্কা-মদীনার মাটির দিকে প্রকৃতিগত ঈমানী টান। কোন্ এক আশ্চর্য আকর্ষণ তাকে নিয়ে এল রসূলের দেশে। কাজ যা হবে হোক, ক'রে নেওয়া যাবে, বেতন যা হবে হোক, পুষিয়ে নেওয়া যাবে, রসূলের দেশে আসার মতো সৌভাগ্য কি সবারই হয়?

কাজ সত্যই রান্নার কাজ। বিকলাঙ্গ হাসপাতালে ক্যাটারিং-এর কাজ। সে হাসপাতালে বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়েরা সরকারী খরচে প্রতিপালিত হয়, প্রশিক্ষিত হয়। সেখান থেকে বাসা দূরে। বাসার কাছাকাছি একটি ইসলামিক সেন্টার আছে। সেখানে অনেক লোক যাতায়াত করে। রাতে হাল্কা খাবার দিয়ে ইসলামী তা'লীম দেওয়া হয় সেখানে। এক সহকর্মীর পীড়াপীড়িতে একদিন রাজীব সেন্টারে এল। সেখানে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু দেশে থাকতে গত ত্রিশ বছরে যা শুনেছে, সেসব কথা ছিল তার উল্টো।

তবে সেন্টারের দায়িত্বশীল আলেম যা বলেন, তার ব্যাপারে তিনি শেষে একটি কথা বলেন, 'আপনাদের অনেকের মনে হবে, আমি কথা হয়তো উল্টাপাল্টা বলি। কিন্তু আপনারা শুনে যান। মানা-না মানা আপনাদের ব্যাপার তবে মহান আল্লাহ বলেছেন, "সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে--- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান।"

বাসায় ফিরে গিয়ে ভাবতে লাগল, সে আসলে বুদ্ধিমান কি না? কাদের কথাটা ঠিক? এখানকার লোকেদেরকে তো আবার 'ওয়াহাবী' বলে। কিন্তু এদের কথার সাথে গ্রামের ফারাযী পাড়ার নাঈমদের কথার অনেক মিল রয়েছে।

সে সেন্টারে আসে ও শুনতে থাকে, অনেক কথা শোনে। অডিওর মাধ্যমে শোনে, ভিডিওর মাধ্যমে শোনে। ইসলামী প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করে, তাতে সে কৃতকার্য হয়।

জীবনের প্রথম সে তাওহীদের সবক নেয়, যা সে কোনদিন শোনেনি। দেশে যা সে ঈমান মনে করত, তা তো সব শির্ক!

আজমীর যাওয়া, পাথরচাপুড়ি যাওয়া এবং সেখানে নযর মানা ও কিছু চাওয়া---সব শির্ক !

বিবাহের পূর্বে কোন মহিলার প্রতি অন্তরের বাইরের প্রেম-প্রকাশ অবৈধ।

রাজীব আবার আজীব হয়ে ভাবতে থাকে। এ দেশের বই-পুস্তক পড়তে থাকে। নিশ্চয় সে অজ্ঞানী নয়। আল্লাহ তাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, সে যাচাই-বাছাই অবশ্যই ক'রে নেবে।

এক সময় মক্কা-মদীনা ঘুরে উমরা ক'রে এল। তাতে তার অনেক অভিজ্ঞতা হল। সে দেশে কোন মাযার বা পাকা কবর সে দেখতে পেল না। আসলে নেইও। মানুষদের বিশ্বাস বড় নির্মল। আর পরিবেশ মানুষকে যা শিক্ষা দেয়, তা অন্য কিছুতে দিতে পারে না।

সে পূর্বেকার সকল প্রকার পাপ থেকে তওবা করল। আগে ঠিকমতো নামায পড়ত না, এখন নিয়মিত নামায পড়তে লাগল। ভেজাল দ্বীনের কথা ভুলে গিয়ে খাঁটি দ্বীন শিক্ষা করতে লাগল।

সে শিউলিকে জানাল তার নতুন পথের সন্ধান লাভের কথা। শিউলিও স্বামীর কথা অনায়াসে মেনে নিল। এবার তাকে বোরকা পরতে হবে।

নাড়ীর টান আর বাড়ির টান যায় না। নারীর টানও কম নয়। 'নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে, তারে বড় কেবা আছে দুখী।' কিন্তু বড় হওয়ার আশা তাকে বিদেশে থাকতে বাধ্য করল। দুই বছরের আগে কোন ছুটি নেই। বুকে পাথর বেঁধে থাকতে হবে। তবে বর্তমানে মোবাইল ও নেটের যোগাযোগ সেই দূরত্বকে অনেক নিকট ক'রে দিয়েছে।

সে অর্থোপার্জন করে, সেই সাথে দ্বীনও। তবে সবাই কি তাই করে? মোটেই না। অনেকে তো পূর্বের চাইতে আরো খারাপ হয়ে যায়।

'বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কূল,
কেউ করল দুনো লাভ কেউ হারাল মূল।'

কিন্তু রাজীব মূল হারায় না। বড় হওয়ার স্বপ্নে এ চেষ্টা তার সর্বশেষ চেষ্টা।

সেন্টারে এসে সে অনেক কথাই শোনে। সে যদি সঊদিয়া না আসত, তাহলে হয়তো মুশরিক হয়ে মরতে হত। আর মুশরিকের জন্য বেহেশ্ত হারাম। সুতরাং বিগত জীবনের যে পতন ঘটেছে, সেই পতনই তাকে নবীর দেশে টেনে এনেছে। আল্লাহ যা করেন, অবশ্যই বান্দার কল্যাণের জন্য।

সেন্টারে সে কুরআন শিক্ষা করে। জীবনের সফলতা ও বিফলতার কথা

শোনে। হুজুর দ্বীন-দুনিয়ার সফলতার ব্যাপারে অনেক কথা বলেন,

'সফলতার চাইতে অসফলতাই তোমাকে অধিক শিক্ষা দিয়ে থাকে।

কোন কোন অসফলতা সফলতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে।

প্রচেষ্টা ও ধৈর্য সফলতার জনক-জননী।

ফল পাওয়ার জন্য শেষ সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষাই হল সফলতার রহস্য।

চীনে এক ধরনের বাঁশ আছে, যা লাগানোর পর প্রথম চার বছর পানি, সার দেওয়ার পরও বাড়ে না। কিন্তু পঞ্চম বছরে বাঁশ গাছটি হঠাৎ ছয় সপ্তাহে ৯০ ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমাদেরও কোন কোন কাজের ফল দেরীতে এবং পূর্ণমাত্রায় লাভ হয়।

পরাজয়কে মেনে নিলে তুমি পরাজিত। মনে যদি তোমার সাহস না থাকে, তবে জেতার আশা করো না। যদি মনে দ্বিধা থাকে তুমি পারবে কি না, তাহলে মনে রেখো তুমি হেরেই গেছ। হারবে ভাবলে, হার তোমার হবেই। কারণ সাফল্য থাকে মনের ইচ্ছা শক্তিতে, মনের কাঠামোতে। যদি ভাব অন্যদের তুলনায় তোমার কাজের মান নিচু, তাহলে তুমি নিচেই থাকবে। যদি তুমি ওপরে উঠতে চাও, তাহলে নিজের মনে সংশয় রেখো না। জীবনযুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই।

সফল মানুষ হল সেই, যে কপট বন্ধু ও অকপট শত্রু পায়। লোকে তাকে পিছন থেকে লাথি মারে। আর তার মানেই সে তাদের অগ্রভাগে থাকে।

আমাদের কেউ কেউ তার বুদ্ধিমত্তার বলে সফলতা লাভ করে, আর কেউ সফলতা লাভ করে অপরের বোকামি দেখে।

তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে সুন্দর উপায় হল, ঘুম ছেড়ে জেগে ওঠা।

সুন্দর দিন সবার জন্য অপেক্ষা করে। কেউ চেষ্টা করে তা আনে, কেউ আনে না।

কর্ম-বিমুখ ছেলেরাই ধনীর মেয়ে বিবাহ করতে চায়।'

বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীদের কথা উদ্ধৃত ক'রে হুজুর শোনান। তাতে রাজীব মুগ্ধ ও প্রীত হয়। তবে শেষের কথাটা শুনে সে মনে মনে বলে, 'আমি শিউলিকে ধনের লোভে বিয়ে করিনি এবং আমি কর্ম-বিমুখও নই।'

রাজীবের জন্য সঊদী আরবের প্রবাসের জীবন একটি আদর্শ কারখানা, তাতে আদর্শ মানুষ তৈরী হয়। অবশ্য সকাল তার জন্য, যে ঘুম ছেড়ে

চোখের পাতা মেলে তাকায়।

ইসলামী তা'লীমে সে উদ্বুদ্ধ হল। সউদী আরবের মেয়েদের পর্দা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তার ইচ্ছা, সে তার শিউলিকে পর্দা করবে, ফুলের মতো দুই মেয়েকেও পর্দা করবে। যাতে তারা তাদের মতো ভুলের শিকারে পরিণত না হয়। এক প্রোগ্রামে সে নিজ দেশের পর্দা ও পণপ্রথার উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করল,

নারী যদি পর্দা না মানে----
নরের নৈতিকতা নামে নিচু ভাটার টানে।
ছড়িয়ে পড়ে বলাৎকার, ধর্ষণ, ব্যভিচার,
সংসার-জীবনে নারী হয়ে ওঠে ভার।
অবহেলিতা হয় শুধু বেপর্দার জন্য,
চরম অপমানে হয় পুরুষ-ভোগ্য-পণ্য।
সহজ-লভ্য হলে কেহ করতে চায় না বিয়ে,
ছেঁড়া জুতার মত ফেলে, ভোগটা সেরে নিয়ে।
কেউ সইতে চায় না মেয়ে-পোষার জ্বালাতন,
যার বিবাহে লাগে যৌতুক, মোটা টাকা পণ।

একদিন ব্যক্তিগতভাবে রাজীব হুজুরকে নিজের জীবনী শুনাল। তার বড় হওয়ার স্বপ্ন ও তাতে কত বাধা-বিপত্তির কথা অকপটে জানিয়ে দিল। হুজুর বললেন, 'বিগত পাপরাশির জন্য তওবা করুন।'

---কিন্তু সমাজের চোখে তো আমরা স্বামী-স্ত্রী ছোট হয়ে থাকব হুজুর!

---আল্লাহ ক্ষমা করলে যথেষ্ট। তাছাড়া আপনি শুনেছেন, 'জাহান্নামীরা জান্নাতে গেলেও তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কলঙ্ক থেকে যাবে।' আর তবেই তো অন্য মানুষ সতর্ক হবে।

---আমি বড় হতে চাই, বড় হওয়ার স্বপ্ন আছে আমার নিদ্রা ও জাগরণে।

---হালাল রুযী অনুসন্ধান করুন। তাতে বর্কত আছে। দুর্বাসনা বর্জন করুন, যা অপূরণীয়। আসল বড় মনের বড়। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কর্ম ক'রে যান, আপনি বড় হবেন। তবে মহান আল্লাহর একটি বাণী শুনুন,

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"

সুতরাং আসল বড়লোক সেই ব্যক্তি, যে পরকালের জমিতে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করতে পেরেছে।'

রাজীব সুসংবাদ নিয়ে বাসায় ফিরে গিয়ে শিউলিকে ফোনে জানিয়ে দিল, 'এবার আমার বড় হওয়ার স্বপ্ন সফল হবে ইনশাআল্লাহ।'

সমাপ্ত